ইসলামের অর্থ ব্যবস্থা

ভূমিকা

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। ইসলামী অর্থনীতি সেই ইসলামী জীবন ব্যবস্থার এক অপরিহার্য অংশ। ইসলামী অর্থব্যবস্থা মানব কল্যাণময়, বৈজ্ঞানিক এবং ভারসাম্যপূর্ণ অর্থব্যবস্থা। ইসলামী অর্থনীতি পুঁজিবাদী বা সমাজবাদী যে কোন অর্থব্যবস্থার তুলনায় প্রগতিশীল এবং মানবতার জন্য কল্যাণকর। ইসলামী অর্থনীতি ইসলামী আদর্শ, জীবন দর্শন ও সভ্যতা-সংস্কৃতির সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। ইসলামী অর্থনীতি ইসলামী সমাজ বিজ্ঞানেরই একটি শাখা।

ইসলামী অর্থনীতি মানুষের সকল প্রকার সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান ও স্থায়ী কল্যাণ সাধন করতে পারে। কেননা, ইসলামী জীবন দর্শন, ধর্ম, কৃষ্টি ও সভ্যতা এবং অর্থনীতি একই সূত্রে গাঁথা। এজন্য ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা বাস্তবায়নে সমাজে পরিপূর্ণ শান্তি ও নিরাপত্তা বিরাজ করে।

এই ইউনিটের পাঠ গুলো হলো-

পাঠ-১ : ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার পরিচয় ও বিষয়বস্তু।

পাঠ-২ : ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য।

পাঠ-৩ : ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা।

পাঠ-৪ : ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায় সম্পদ উৎপাদন, ভোগ ও বিনিময় নীতি।

পাঠ-৫ : ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় আয়ের উৎস।

পাঠ-৬ : ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায় যাকাতের ভূমিকা।

পাঠ-৭ : যাকাতের নিসাব ও যাকাত ব্যয়ের খাতসমূহ।

পাঠ- ৮ : উশর, খারাজ ও জিযিয়া।

পাঠ- ৯ : ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায় সাদাকার ভূমিকা।

পাঠ-১০ : ইসলামী অর্থব্যবস্থায় ব্যবসা হালাল ও সুদ হারাম কেন।

ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার পরিচয় ও বিষয়বস্তু

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার পরিচয় দিতে পারবেন।
- ইসলামী অর্থব্যবস্থার বিষয়বস্তু উল্লেখ করতে পারবেন।
- ইসলামী অর্থব্যবস্থার মূল কথা বর্ণনা করতে পারবেন।

১.১ ইসলামী অর্থব্যবস্থার পরিচয়

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। ইসলামী অর্থনীতি সেই ইসলামী জীবনব্যবস্থার এক অপরিহার্য অংশ। ইসলামী অর্থব্যবস্থা মানব কল্যাণময়, বৈজ্ঞানিক এবং ভারসাম্যপূর্ণ অর্থব্যবস্থা। ইসলামী অর্থনীতি পুঁজিবাদী বা সমাজবাদী যে কোন অর্থব্যবস্থার তুলনায় প্রগতিশীল এবং মানবতার জন্য কল্যাণকর। ইসলামী অর্থনীতি ইসলামী আদর্শ, জীবন দর্শন ও সভ্যতা-সংস্কৃতির সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। ইসলামী অর্থনীতি ইসলামী সমাজ বিজ্ঞানেরই একটি শাখা। ইসলামী অর্থনীতির যেসব সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে তার সারকথা হিসেবে ডঃ এম. এ. মান্নান লেখেন–

"Islamic Economics is a social science which studies Economic problems of the people in the light of Islam." অর্থাৎ "ইসলামী অর্থনীতি হচ্ছে একটি সমাজ বিজ্ঞান যা ইসলামের আলোকে মানুষের অর্থনৈতিক সমস্যাবলী আলোচনা করে।"

কোন কোন অর্থনীতিবিদ-এর মতে, "যে সমাজ বিজ্ঞান ইসলামী ভাবধারায় অনুপ্রাণিত জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক সমস্যা পর্যালোচনা করে, তা-ই ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা।"

সহজ কথায় আল্লাহর দেয়া ইসলামী বিধি-নিষেধ রক্ষা করে, উৎপাদন, আয়, উপার্জন, ব্যয়-বণ্টন ও ভোগ-ব্যবহার সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী পরিচালনার জ্ঞান ও বাস্তব কার্যক্রম গ্রহণ করে যে অর্থ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হয় তা-ই ইসলামী অর্থনীতি।

১.২ ইসলামী অর্থব্যবস্থার বিষয়বস্তু

বিশ্বমানবের স্থায়ী শান্তিদাতা ও কল্যাণময় অর্থব্যবস্থা পেশ করেছে। ইসলামী অর্থনীতি মানুষের সকল প্রকার সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান ও স্থায়ী কল্যাণ সাধন করতে পারে। কেননা, ইসলামী জীবন দর্শন, ধর্ম, কৃষ্টি ও সভ্যতা এবং অর্থনীতি একই সূত্রে গাঁথা। এজন্য ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা বাস্তবায়নে সমাজে পরিপূর্ণ শান্তি ও নিরাপত্তা স্থাপিত হয়।

ইসলামী অর্থনীতির বিষয়বস্তু ও পরিধি সম্বন্ধে অর্থনীতিবিদগণের মত হল–

ডঃ এম. এ. মান্নানের মতে, ইসলামী অর্থনীতির বিষয়বস্তু হচ্ছে গণমানুষের যাবতীয় অর্থনৈতিক সমস্যা যা ইসলামের আলোকে সমাধান যোগ্য।

অধ্যাপক খুরশীদ আহমদের মতে, ইসলামী অর্থনীতির বিষয়বস্তু হচ্ছে– সে সব অর্থনৈতিক বিষয়াবলী যা কুর'আন ও সুন্নাহয় বিধৃত মূল্যবোধের গভীরে নিহিত।

শামসুল আলমের মতে, ইসলামী অর্থনীতির বিষয়বস্তু হচ্ছে– মানব কল্যাণ এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট উৎপাদন, বণ্টন ও ভোগ, যা ইসলামী দৃষ্টিতে বিশ্লেষণমূলক।

মোটকথা ইসলামী অর্থনীতির বিষয়বস্তু হচ্ছে– ইসলামী নৈতিক ও ধর্মীয় অনুশাসনের অবকাঠামোর অধীনে সীমিত সম্পদের ব্যবহারিক প্রশাসন।

অর্থনীতি কেবল মানব কল্যাণের বস্তুগত কারণসমূহই আলোচনা করে না; বরং ভোগ ও উৎপাদনের ক্ষেত্রে ইসলামের বিধি-নিষেধসমূহ আলোচনা করে।

১.৩ ইসলামী অর্থব্যবস্থার মূলনীতি

বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ অধ্যাপক আবদুল গফুর সাহেব "আসমান যমীনের মালিক", গ্রন্থে ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার মূলনীতি সহজ- সরল ভাষায় সংক্ষেপে চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন–

১. সম্পদের মালিকানা

সমস্ত সম্পদের ওপর একমাত্র আল্লাহর মালিকানা স্বীকৃত থাকবে। মানুষ ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগতভাবে সম্পদের আমানতদার হবে, মালিক নয়।

২. সকলের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা

আল্লাহর নেয়ামত তথা সম্পদে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের ভরণ-পোষণের অধিকার থাকবে।

৩. আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তা

মানুষ সম্পদের অধিকারী হবে সাধারণত শ্রমের ভিত্তিতে। কিন্তু যাদের শ্রমের মাধ্যমে জীবিকা উপার্জনের শক্তি বা সুযোগ থাকবে না– যেমন পঙ্গু, বৃদ্ধ, বেকার- তাদের জন্য যাকাত বা অন্য কোন ব্যবস্থার মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান করা হবে।

৪. সীমিত ব্যক্তি মালিকানা

সীমিত অর্থের ব্যক্তিগত সম্পত্তি (মালিকানা নয়) মানুষের থাকবে এবং উত্তরাধিকার আইনও চালু থাকবে।

৫. সুদ-জুয়া নিষিদ্ধ

শ্রমবিহীন শোষণমূলক আয়ের পথ যেমন– সুদ ও জুয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ থাকবে।

৬. অর্থনৈতিক দুর্নীতি নিষিদ্ধ

ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প বা কৃষি থাকবে। তবে দুর্নীতি, চোরাচালানী, ওজনে কারচুপি, মজুদদারী, মুনাফাখোরী, ভেজাল মেশানো, অন্যায় জবর-দখল ইত্যাদি কড়াকড়িভাবে নিষিদ্ধ থাকবে।

৭. অপচয়-অপব্যয় নিষিদ্ধ

বিলাসিতা, অপচয় কঠোরভাবে নিষিদ্ধ থাকবে। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে মানুষ সহজ সরল জীবন যাপন করবে।

৮. সম্পদের সুষম বণ্টন

সম্পদের সুষম বণ্টন চালু হবে। অর্থাৎ মানুষ প্রয়োজন অনুপাতে সম্পদ ভোগ করবে। ধনবৈষম্যের যথাসাধ্য অবসান ঘটাতে হবে। রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বে আসীন ব্যক্তিরা সাধারণ অর্থনৈতিক জীবন যাপন করে সকলের সামনে দৃষ্টান্ত স্থাপন করবেন।

৯. রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব

ব্যক্তিগত সম্পত্তির ওপর কারও নিরঙ্কুশ অধিকার তথা মালিকানা নেই। রাষ্ট্র জনগণের বৃহত্তর প্রয়োজনে কারও প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ উপযুক্ত ব্যবস্থাধীনে নিয়ে নিতে পারবে।

১০. ব্যক্তি ও অপরের প্রয়োজনে ব্যয়

ব্যক্তি তার নিজের ও পরিবারের প্রয়োজন পূরণের পর নিজের সম্পদ সমাজের অন্যান্য অভাবী লোকদের অভাব পূরণের জন্য তৈরি রাখবে।

১১. আন্তর্জাতিক প্রয়োজন পূরণ

কোন রাষ্ট্রীয় সীমানার অন্তর্ভুক্ত সম্পদ দেশের প্রয়োজন পূরণের পর অন্য অভাবগ্রস্ত দেশের প্রয়োজন পূরণের জন্য তৈরি রাখতে হবে।

সার-সংক্ষেপ

ইসলামী অর্থব্যবস্থার এ নীতিগুলো কতইনা সুন্দর ও মানবতাবাদী। এ অর্থ ব্যবস্থা বাস্তবায়ন হলে সমাজে অশান্তি, দুঃখ-বেদনা ও বঞ্চনা কিছুই থাকত না। ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বিশ্ব গড়ায় এর বিকল্প নেই।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৯.১

ক. নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন : খালি স্থানে উপযুক্ত শব্দ বসিয়ে পূরণ করুন-

১. ড. এম. এ মান্নানের মতে ইসলামী অর্থনীতি হচ্ছে একটি ..... বিজ্ঞান, না ইসলামের আলোকে ..... মানুষের অর্থনৈতিক ..... আলোচনা করে। ইসলামী অর্থনীতির বিষয়বস্তু হচ্ছে ..... যাবতীয় অর্থনৈতিক ..... যা ইসলামের আলোকে ..... যোগ্য।

২. সমস্ত সম্পদের ওপর একমাত্র ..... মালিকানা স্বীকৃত থাকবে। মানুষ ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত ভাবে সম্পদের ..... হবে মালিক নয়।

৩. ইসলামী অর্থব্যবস্থার এ নীতিগুলো কতইনা সুন্দর ও ..... । এ অর্থব্যবস্থা বাস্তবায়ন হলে সমাজে অশান্তি, দুঃখ-বেদনা ও ..... কিছুই থাকত না। ক্ষুধা ও দারিদ্র্যতম ..... গড়ায় এর ..... নেই।

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. ইসলামী অর্থব্যবস্থার পরিচয় লিখুন।
২. ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার বিষয়বস্তু উল্লেখ করুন।
৩. ইসলামী অর্থব্যবস্থার মূলনীতি কী কী?

ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য তুলে ধরতে পারবেন।
- অন্যান্য অর্থ ব্যবস্থার তুলনায় ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা কল্যাণময় তা বর্ণনা করতে পারবেন।

২.১ ইসলামী অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য

বর্তমান বিশ্বে প্রচলিত পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থাসহ সকল মানব রচিত অর্থনীতি থেকে ইসলামী অর্থনীতি আলাদা বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। ইসলামী অর্থনীতির কতিপয় মৌলিক বৈশিষ্ট্য আছে; তা অন্যান্য অর্থব্যবস্থা থেকে উন্নত এবং মানব কল্যাণময়। নিম্নের আলোচনা থেকে তা স্পষ্ঠভাবে তুলে ধরতে পারবেন।

১. সম্পদের মালিকানা

ইসলামী অর্থনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হল সম্পদের প্রকৃত মালিকানা আল্লাহ তা'আলার। মানুষ একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সম্পদের আয়-উপার্জন ও ভোগ-ব্যবহারে অধিকারী মাত্র। প্রকৃত মালিকের প্রতিনিধি হিসেবে মানুষ তা ভোগ-ব্যবহার করবে। এ মর্মে পবিত্র কুরআনে আছে : "আকাশ ও পৃথিবীর মালিকানা আল্লাহর জন্যে।"

২. নিয়ন্ত্রিত ব্যক্তি-মালিকানা

ইসলামী অর্থনীতিতে নিয়ন্ত্রিত ব্যক্তি মালিকানা স্বীকার করে। উপার্জন ও আয়ের ক্ষেত্রে ধর্মীয় বিধি-নিষেধ মেনে যে অর্থ-সম্পদ উপার্জন করা হবে তার মালিক হবে উপার্জনকারী। এতে কারও অধিকার থাকবে না।

৩. আয় বা উপার্জন পদ্ধতি

ইসলাম যে কোন উপায়ে বৈধ-অবৈধ চিন্তা না করে এবং অন্য মানুষের কল্যাণ-অকল্যাণ না ভেবে ঢালাও ভাবে ধন-সম্পদ উপার্জন করতে বারণ করেছে। যেমন, পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে : "হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা অবৈধ উপায়ে অর্থ উপার্জন করো না।" (সূরা নিসা) মহানবী (স) বলেছেন : "যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে কারও একবিঘত যমীন দখল করেছে ; কিয়ামতের দিন তার গলায় সাত তবক জমিন লটকিয়ে দেয়া হবে।"

৪. বণ্টন পদ্ধতি

ইসলামী অর্থনীতিতে সম্পদ কোন এক ব্যক্তির হাতে যাতে পূঞ্জীভূত না হয়- সে জন্যে সুষম বণ্টন নীতি অবলম্বন করেছে। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে : "সম্পদ যাতে কেবলমাত্র তোমাদের (ধনীদের) হাতে পূঞ্জিভূত না হয়ে থাকে।" (সূরা হাশর)

৫. সঞ্চয়ের নিষেধাজ্ঞা

মূল্য বৃদ্ধি বা অধিক মুনাফা লাভের আশায় সম্পদ জমা করে রাখা এবং যাকাত আদায় না করে সম্পদের পাহাড় গড়ে তোলাকে ইসলাম কঠোর ভাষায় নিষেধ করেছে। যেমন- কুরআনে এসেছে : "যারা স্বর্ণরৌপ্য জমা করবে ও তার যাকাত দেবে না, তাদের জন্যে রয়েছে কঠিন শাস্তির দুঃসংবাদ।" (সূরা তাওবা)

৬. অবৈধ উপার্জন নিষিদ্ধ

নাপাক ও হারাম বস্তুর ব্যবসায়, ভিক্ষাবৃত্তি, জবর দখল, ঘুষ গ্রহণ আত্মসাৎ, অধিকার হরণ ইত্যাদি অবৈধ উপায়ে অর্থ উপার্জনের প্রতি ইসলাম কঠোরভাবে নিষেধ করেছে।

৭. সুদ প্রথা উচ্ছেদ

সুদ মানবতার জন্যে অভিশাপ। এ জন্যে ইসলাম সুদকে হারাম করে ব্যবসায়কে হালাল করেছে। যাকাত ও সাদকার মাধ্যমে বা বিনা সুদে বিত্তহীনদের সাহায্যের কথা বলা হয়েছে।

৮. অর্থনৈতিক সাম্য নীতির প্রবর্তন

ইসলামের দৃষ্টিতে পূর্ণ অর্থনৈতিক সাম্য বাস্তবে সম্ভব নয়। এটা রাষ্ট্র পরিচালনা ও সভ্যতার পক্ষেও তা অনুকূল নয়। তাই ইসলাম ধন-সম্পদ বণ্টনের সুষ্ঠু ব্যবস্থা দিয়েছে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ জমা করে না রেখে বরং তা নিঃস্ব ও অভাবীদের মাঝে বন্টন করে দিতে বাধ্য করেছে।

৯. সম্পদহীনদের অংশ পরিশোধ

মহান আল্লাহ সকল জীবের মত মানুষেরও জীবিকার ব্যবস্থা করেন। অথচ সম্পদ দান করেছেন কতিপয় বিশেষ ব্যক্তিকে। এতে বোঝা যায় যে, সম্পদ যার হাতেই থাকুক না কেন তাতে সকলের অধিকার আছে। যেমন- আল্লাহ বলেন : "তোমাদের ধন সম্পদের মধ্যে গরীব, বঞ্চিত প্রার্থীদেরও অধিকার আছে।" তিনি আরও বলেন : "তাদের প্রাপ্য অংশ শস্য কর্তনের দিনেই দিয়ে দাও।"

১০. যাকাত ব্যবস্থা চালু

ইসলামী অর্থনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য যাকাত ব্যবস্থা চালু। মানুষের বৈধভাবে অর্জিত সম্পদ নির্দিষ্ট পরিমাণে পৌঁছলে ইসলাম নির্দিষ্টহারে যাকাত দানকে ফরয করে দিয়েছে। এ যাকাত নগদ অর্থ, স্বর্ণ-রৌপ্য, ব্যবসায়ে পণ্য, কৃষি ফসল, গবাদি পশু প্রভৃতি সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সুতরাং অর্থনীতির ভারসাম্য রক্ষায় যাকাতের ভূমিকা সীমাহীন।

১১. দান-সাদাকাহ চালু

নির্ধারিত যাকাত পরও সম্পদ থেকে ঐচ্ছিক দান হিসেবে দুর্গত মানবতার জন্যে দান-সাদকা প্রদান করার নিয়মও চালু করা হয়েছে।

১২. উত্তরাধিকার বণ্টন ব্যবস্থা

ইসলামী অর্থনীতির অন্যতম চাবিকাঠি উত্তরাধিকার বণ্টন নীতি। মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া সম্পদ ব্যয়-বণ্টনের মাধ্যমে সম্পদের মালিকানায় ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে এবং অর্থনীতি সচল হয়।

১৩. গণীমত বা যুদ্ধলব্ধ সম্পদের ব্যবস্থা

ইসলামী অর্থনীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল গণীমতে প্রাপ্য সম্পদকেও সুষম পদ্ধতিতে বিলি বণ্টনের ব্যবস্থা করা।

১৪. জুয়া-লটারী নিষিদ্ধ

জুয়া ও লটারীর মাধ্যমে অর্থ উপার্জন মানবতার জন্যে আরও একটি অভিশাপ। এ অভিশাপ থেকে মুক্ত করার জন্য ইসলাম জুয়া-লটারীকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে।

১৫. অপব্যয় ও অপচয় নিষিদ্ধ

ইসলামী অর্থনীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল– ইসলাম সম্পদের যাবতীয় অপব্যয় ও অপচয়কে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। মহান আল্লাহ এ প্রসঙ্গে বলেন :

ক. "খাও, পান করো, কিন্তু অপচয় করো না। আল্লাহ অপচয়কারীকে ভালবাসেন না।"

খ. "নিশ্চয়ই অপব্যয়কারী শয়তানের ভাই।"

১৬. ব্যবসায়-বাণিজ্যে অসাধুতা নিষিদ্ধ

ইসলামী অর্থনীতিতে ব্যবসায়-বাণিজ্যে অসততা, প্রতারণা, ফটকাবাজি, দুর্নীতি, ওজনে ফাঁকি, ভেজাল, মিথ্যা শপথ ইত্যাকার যাবতীয় অসাধুতা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে।

১৭. বাইতুল মাল গঠন

ইসলামী অর্থনীতিতে বাইতুল মাল বা সরকারি তহবিল গঠনের নির্দেশ রয়েছে। রাষ্ট্রীয় আয়ের একটি অংশ বাইতুল মালে জমা থাকবে। দেশের যে কোন নিরুপায় ব্যক্তির বা রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে অর্থ যোগান দেয়াই বাইতুল মালের উদ্দেশ্য।

সার-সংক্ষেপ

ইসলামী অর্থনীতি একটি মানব কল্যাণময় প্রগতিশীল আদর্শ অর্থব্যবস্থা। এ অর্থনীতি প্রবর্তিত হলে সমাজ থেকে যাবতীয় অর্থনৈতিক দুর্নীতি ও অসাম্য দূর একটি সুষ্ঠু, সুন্দর ও সমৃদ্ধ সমাজ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

পাঠোত্তর মূল্যানয় : ৯.২

ক. নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন : এক কথায় উত্তর দিন-

১. ইসলামী অর্থনীতিতে সম্পাদনের প্রকৃত মালিক কে?

২. মানুষ সম্পদ কী হিসেবে ভোগ ব্যবহার করে?

৩. ইসলামী অর্থনীতিতে সম্পাদের ব্যক্তি-মালিকা স্বীকার করে কী?

৪. ইসলামী অর্থনৈতিতে আয়-উপার্জনের মূলনীতি কী?

৫. পূর্ণ অর্থনীতিক সাম্য কি সম্ভব?

৬. নির্ধারিত হারে যাকাত প্রদানের পরও কী কোন দান করতে হয়?

৭. জুয়া ও লটারীর মাধ্যমে অর্থ-উপার্জন কী?

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. ইসলামী অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য সমূহ কী কী?

২. ইসলামী অর্থনীতিতে ব্যক্তির নিয়ন্ত্রিত মালিকানা স্বীকৃত? ব্যাখ্যা করুন।

৩. ইসলামী অপব্যয় ও অপচয় নিষিদ্ধ"- বিশ্লেষণ করুন।

পাঠ ৩ ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- ইসলামী অথ্য ব্যবস্থার গুরুত্ব উল্লেখ করতে পারবেন।
- ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরতে পারবেন।

৩.১ ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায় গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

ইসলামী অর্থনীতি হচ্ছে- ইসলামের নৈতিক ও ধর্মীয় অনুশাসনের অবকাঠামোর অধীনে সীমিত সম্পদের ব্যবহারিক প্রশাসন। বিশ্ব মানবের স্থায়ী শান্তিদাতা ও কল্যাণময় অর্থ ব্যবস্থা দিয়েছে ইসলাম। ইসলামী অর্থনীতিই বিশ্ব মানবতাকে প্রকৃত মনুষ্যত্বের সীমায় উন্নীত করে। মানুষের অর্থনৈতিক সকল প্রকার সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান ও দিক নির্দেশনা হয়েছে সিলামী অর্থ দর্শনে। ইসলামী জীবন দর্শনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হচ্ছে ইসলামের অর্থব্যবস্থা। এটা বাস্তবায়নে সমাজে পরিপূর্ণ শান্তি ও নিরাপত্তা স্থাপিত হতে পারে। মানবতার সার্বিক কল্যাণে ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

১. দারিদ্র্য বিমোচনে

সমাজের মানুষ কখন আপ্রাণ প্রচেষ্টা করেও জীবন ধারণের মৌলিক চাহিদা অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও শিক্ষার প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম হয় না। তখন মানুষ কু-রিপু ও কু-প্রবৃত্তির তাড়নায় অপরাধের দিকে ধাবিত হয় এবং সমাজে অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। তাই ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায় মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণের ব্যবস্থা রয়েছে। ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায় নিজের প্রয়োজনাতিরিক্ত সম্পদ যাকাত, সাদকাহ, দান-খয়রাত, অসিয়ত ইত্যাদির মাধ্যমে সামাজিক ও সামগ্রিক স্বার্থে ব্যয় করার বিধান রয়েছে। কাজেই ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা বাস্তবায়ন হলে দারিদ্র্যের অবসান ঘটে। ফলে সমাজে শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়।

২. সুষম অর্থনৈতিক ব্যবস্থার জন্য

সমাজের এক শ্রেণীর লোক যখন সম্পদের পাহাড় গড়ে বিলাস-ব্যসনে দিন কাটায়। পক্ষান্তরে অপর শ্রেণী অনাহারে-অর্ধাহারে মানবেতর জীবন-যাপন করে। তখনই সমাজে হিংসা-বিদ্বেষ, চুরি-ডাকাতি, লুট-তরাজ, হিংসা-জিঘাংসা ইত্যাদি শান্তি বিনষ্টকারী কার্যকলাপ সংঘটিত হয়। ফলে সমাজে অশান্তি দেখা দেয় এবং প্রত্যেকে অশান্তি ও নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে। কিন্তু ইসলামী অর্থনীতি চালু হলে সম্পদ কতিপয় লোকের হাতে পুঁঞ্জীভূত থাকে না। বরং ধনী-দরিদ্রের মধ্যে অর্থনৈতিক ভারসাম্য বজায় থাকে। সমাজ এক সুষম অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সুফল ভোগ করতে থাকে। ফলে সমাজে শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় থাকে।

৩. কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র সৃষ্টি

বেকারত্ব এক সর্বগ্রাসী অভিশাপ। বেকারত্ব দারিদ্র্য ডেকে আনে এবং বিভিন্ন অপরাধ প্রবণতার দিকে ঠেলে দেয়। তাছাড়া অনেকে মূলধনের অভাবে কোন কর্মের সংস্থান করতে পারে না। ইসলামী সমাজে প্রত্যেক নাগরিকের ন্যূনতম প্রয়োজন মেটানোর দায়িত্ব সরকারের। এজন্য ইসলাম নির্দেশিত যাকাত, সাদাকা, দান-খয়রাত ইত্যাদির মাধ্যমে লোকদের অভাব বিমোচন করা হয়। যাকাত ও সাদ্কার অর্থ সংগ্রহ করে ইসলামী সমাজে বিভিন্ন ধরনের শিল্প-কারখানা ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র সৃষ্টি করা যায়। এতে লোকদের বেকার হাতকে কর্মীর হাতে ও ভিক্ষুকের হাতকে দাতার হাতে পরিণত করে। ফলে আর্থ-সামাজিক স্বচ্ছলতা সৃষ্টি হয়। সমাজে শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় থাকে।

৪. অর্থের মোহ দূর হয়

কথায় বলে, 'অর্থই অনর্থের মূল'। অর্থের মোহই মানুষকে ইতর থেকে ইতরতর পর্যায়ে নামিয়ে দেয়। অর্থের মোহ মানুষকে অন্ধ করে তোলে। এ অবস্থায় বৈধাবৈধ যে কোন উপায়ে অর্থোপার্জন করার প্রতিযোগিতায় নেমে পড়ে। আর সমাজে সৃষ্টি করে অশান্তি ও অরাজকতা। কিন্তু ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায় অর্থের প্রতি উদগ্র মোহ ও লালসাকে দূরীভূত করে দিয়েছে, অর্থকে মানুষের জীবনের মূল লক্ষ্য হিসেবে নয়। বরং জীবন ধারণের একটি উপায় হিসেবে নির্ধারণ করেছে। এজন্য কেউ যেন অর্থের পাহাড় গড়ে তুলতে না পারে, ইসলাম সে ব্যবস্থা দিয়েছে। ফলে ইসলামী সমাজে অর্থের মোহ থাকে না, এতে শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়।

৫. ভ্রাতৃত্ব ও সাম্যের পরিবেশ সৃষ্টিতে

ইসলামী অর্থ-দর্শনের মূল লক্ষ্য হচ্ছে, সমাজের মানুষের মধ্যে সামাজিক সম্প্রীতি, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব গড়ে তোলা। সমাজে শান্তি ও নিরাপত্তা বিধান করার পূর্বশর্ত হচ্ছে সামাজিক সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি। ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায় সমাজে প্রত্যেক মানুষ অপরের প্রয়োজনকে নিজের প্রয়োজন মনে করে। সর্বদা অন্যের অভাব ও প্রয়োজন মোচনে সক্রিয়ভাবে এগিয়ে আসে। ফলে সমাজে ভ্রাতৃত্ব ও সাম্য সৃষ্টি হয় এবং অশান্তি দূরীভূত হয়ে যায়।

৬. সহযোগিতার মনোভাব সৃষ্টিতে

ইসলামী অর্থ-দর্শনে একই সাথে ব্যক্তি স্বার্থ ও সামগ্রিক স্বার্থ বিজড়িত। তাই পারস্পরিক দ্বন্দ্ব, সংঘাত ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরিবর্তে পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাব গড়ে ওঠে। তাছাড়া এতে সহানুভূতি, সহমর্মিতা, বদান্যতা, মহানুভবতা ও ভ্রাতৃত্ববোধমূলক মহোত্তম গুণরাজিরও বিকাশ ঘটে। আর পারস্পরিক সহানুভূতি, সহযোগিতা ও সহনশীলতা সমাজে শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য অপরিহার্যও বটে। যেমন– এখানে ধনী-দরিদ্র ও মালিক-শ্রমিককে বিপক্ষ না ধরে বরং পরস্পরের বন্ধু হিসেবে মনে করা হয়। যার ফলে সমাজে শান্তি ও নিরাপত্তা বিরাজ করে।

৭. অর্থনৈতিক সুবিচার প্রতিষ্ঠায়

ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা অর্থনৈতিক ন্যায়বিচারের-ই নামান্তর। ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হলে সমাজ থেকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যাবতীয় অনাচার ও অবিচার দূর হয়ে সুন্দর, সুষ্ঠু ও কল্যাণকর ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা লাভ করে। যা সমাজে শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য অপরিহার্য।

সার-সংক্ষেপ

ইসলামী অর্থ-দর্শন হচ্ছে, আল্লাহ্‌র ইচ্ছার সামনে সম্পূণ সোপর্দ করার মনোবৃত্তি সৃষ্টি করা। কাজেই বস্তুবাদী অর্থ ব্যবস্থার সুপ্ত শোষণের মনোবৃত্তি এখানে অনুপস্থিত। H.G.Wells তাই যথার্থই বলেছেন– "ইসলাম সামাজিক উৎপীড়ন ব্যবস্থা ও নিষ্ঠুরতা দূর করে যে নুতন সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করেছে, তা ইতিহাসে নজীরবিহীন।"

ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা 'মানুষ মানুষের জন্য'- এ মহাসত্যকে সামনে রেখে তার যাবতীয় ব্যবস্থা নির্ধারণ করেছে। মানব কল্যাণ-ই ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য। সুতরাং ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৯.৩

ক. নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন : সত্য ও মিথ্যা নির্ণয় করুন।

১. ইসলামী অর্থনীতি হচ্ছে ইসলামের নৈতিক ও ধর্মীয় অনুশাসনের অবকাঠামোর অধীনে-সীমিত সম্পদের ব্যবহারিক প্রশাসন।
২. ইসলামী অর্থনৈতিই বিশ্ব মানবতাকে প্রকৃত মনুষ্যত্বে সীমায় উন্নীত করে।
৩. ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায় মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা নেই।
৪. ইসলামী অর্থ দর্শনের মূল লক্ষ্য হচ্ছে- সমাজের মানুষের মধ্যে সামাজিক সম্প্রীতি, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব গড়ে তোলা।
৫. ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা নৈতিক অবিচারের নামান্তর।

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার গুরুত্ব তুলে ধরুন।
২. ইসামী অর্থ ব্যবস্থার কী কোন প্রয়োজনীয়তা আছে?
৩. ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায় কিভাবে দারিদ্র্য বিমোচন ঘটবে?
৪. "ইসলাম অর্থনৈতিক সুবিচার প্রতিষ্ঠার জন্য অপরিহার্য" ব্যাখ্যা করুন।

ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায় সম্পদ উৎপাদন, ভোগ ও বিনিময় নীতি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায় উৎপাদনের মূলনীতি বর্ণনা করতে পারবেন।
- ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায় সম্পদের ভোগ ও ব্যবহার নীতি উল্লেখ করতে পারবেন।
- ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায় সম্পদের বিনিময় নীতি সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

৪.১ ইসলামী অর্থব্যবস্থায় সম্পদ উৎপাদনের মূলনীতি

ইসলাম বৈরাগ্যের ধর্ম নয়। ইসলামে আয়-উপার্জন তথা উৎপাদনকে উৎসাহিত করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَوٰةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ

"সালাত সমাপ্ত হয়ে গেলে পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগহরাজি অন্বেষণ কর।" (সূরা জুমুআ : ১০)

সম্পদ উৎপাদনের নীতি হচ্ছে-

১. উৎসাহদান

মহানবী (স) ফজর সালাত আদায়ের পরে জীবিকা অর্জন না করে অলসভাবে ঘুমাতে নিষেধ করেছেন। ইসলামে যেমন জীবিকা উপার্জনে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে, তেমনি সম্পদ উৎপাদনে কিছু বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়েছে।

২. মানুষের ক্ষতিকর উৎপাদন হারাম

যে সব উপায় অবলম্বন করলে কোন না কোন মানুষের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোন ক্ষতি সাধিত হয়, সে সব উপায় অবলম্বন করা ইসলামের দৃষ্টিতে হারাম।

আবার যে সব উপায় অবলম্বন করলে অন্যের ন্যায়সঙ্গত অধিকার ক্ষুণ্ন হয় সে সব উপায় অবলম্বন করা যাবে না।

এমনিভাবে যে সব সম্পদ উৎপাদনে মানুষের নৈতিকতা ও মূল্যবোধের অবক্ষয় হয়, সমাজের ক্ষতি হয়– সে সব সম্পদ উৎপাদন করা যাবে না। যেমন- মাদক দ্রব্য উৎপাদন বা এর ব্যবসায় করা সাধারণ অর্থনীতিতে অন্যায় নাও হতে পারে কিন্তু ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায় অবশ্যই হারাম।

৩. ভূমি ফেলে রাখা বৈধ নয়

ভূমি আল্লাহর দান, একে ব্যবহার না করে ফেলে রাখা যাবে না।

৪. শ্রমের মর্যাদা দান

শ্রমকে ইসলামে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখা হয়েছে এবং উৎসাহিত করা হয়েছে। শ্রমিকের মর্যাদা দেয়া হয়েছে। শ্রমিকের ন্যায্য মজুরী দিতে হবে। মজুরী দিতে গড়িমসি করা বৈধ নয়। সাথে সাথেই দিয়ে দিতে হবে।

আবার শ্রমিক যে সৎভাবে শ্রম বিনিয়োগের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

আল্লাহর রাসূল (স) বলেছেন,

خَيْرُ الْكَسْبِ كَسْبُ يَدُ الْعَامِلِ إِذَا نَصَحَ

"শ্রমিকের হাতে উপার্জনই উত্তম উপার্জন, যখন সে আন্তরিকতার সাথে কাজ করে।"

আল্লাহর রাসূল (স) আরও বলেন,

"দু'হাতে উপার্জিত খাদ্যের চেয়ে উত্তম খাদ্য কেউ কোন দিন খায়নি।" (বুখারী)

ইসলামে অর্থ-সম্পদ উৎপাদন, উপার্জন ও ব্যয় সবকিছুর জন্যই নির্দিষ্ট বিধান আছে। আয়-উৎপাদনের ব্যাপারে সে সব বিধি-নিষেধ মেনে চলতে হয়। নীতি-নৈতিকতা বর্জন করে যে কোন উপায়ে ইসলাম আয়-উৎপাদন করতে বলে না। আর তার বৈধতাও ইসলামে নেই।

৪.২ ইসলামী অর্থব্যবস্থায় সম্পদ ভোগ ও ব্যবহারের নীতি

ইসলাম একটি নৈতিক জীবন বিধান। ইসলামের সবকিছু নৈতিক বাধনে নিয়ন্ত্রিত। ইসলামে যেমন আয়-উপার্জন বা সম্পদ উৎপাদনের ব্যাপারে নীতি রয়েছে। তেমনি সম্পদ ভোগ বা ব্যবহারের ব্যাপারেও নীতি রয়েছে। সে সব নীতি মেনেই সম্পদ ভোগ-ব্যবহার করা যাবে। যেমন-

১. অপব্যয় অবৈধ

নিজের প্রয়োজনে সম্পদ ব্যবহার করা যাবে, কিন্তু অপব্যয় করা যাবে না।
আল্লাহ বলেন,

كُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا

"তোমরা পানাহার কর, কিন্তু অপব্যয় কর না।" (সূরা আ'রাফ : ৩১)

২. সম্পদ প্রয়োজনমত ভোগ করা যাবে

সম্পদ যেমন অপব্যয় করা যাবে না, তেমনি কৃপণতা করে ধরে রাখাও যাবে না। নিজের ন্যূনতম প্রয়োজন মিটে গেলে অন্যদের প্রয়োজন মেটাতে হবে, কারণ সম্পদের প্রকৃত মালিক আল্লাহ তা'আলা। তিনিই ধনীদের সম্পদে গরীবদের অংশ রেখেছেন। তিনি বলেছেন,

وَفِيْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ

"তাদের (ধনীদের) সম্পদে বঞ্চিত ও দরিদ্রদের অধিকার রয়েছে।" (সূরা যারিয়াত : ১৯)

৩. বিলাসিতায় সম্পদ ব্যয় করা যাবে না

ভোগ-বিলাসে সম্পদ ব্যয় করার অধিকার কারও নেই। সম্পদ ব্যবহারের ব্যাপারে ইসলামের নির্দেশ হচ্ছে– "সম্পদ ব্যয়ের ব্যাপারে মধ্যপন্থা অবলম্বন কর এবং জীবন ধারণের জন্য যা প্রয়োজন, তার বেশি খরচ করবে না। লোক দেখানের উদ্দেশে অপব্যয় করা বাঞ্ছিত নয়।"

৪. ভোগে নয়-ত্যাগেই সুখ

সম্পদ ব্যয় করার সময় নিজের কু-প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করার চেয়ে অন্যের অভাব-অভিযোগ দূর করার চেষ্টা কর এবং তোমার সম্পদ দরিদ্র, অভাবগ্রস্ত, বঞ্চিতদের উপকার এবং জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় কর। কেননা, ভোগে নয়- ত্যাগেই সুখ।

ইসলামে মানুষকে সম্পদ থেকে ন্যূনতম প্রয়োজন পূরণের কথা বলে। ইসলাম মানুষকে নিজে ভোগের চেয়ে ত্যাগের প্রতি উৎসাহিত করে। অবৈধ ও অনৈতিকভাবে ভোগ-ব্যবহারের কঠোর বিরোধিতা করে।

৪.৩ ইসলামী অর্থব্যবস্থায় সম্পদ বিনিময় নীতি

কোন মানুষই স্বয়ংসম্পূর্ণ বা অভাবমুক্ত নয়। জীবনধারণে একে অন্যের ওপর নির্ভর করতে হয়। জীবন-যাপনের প্রয়োজনাদি পূরণের উদ্দেশে ক্রয়-বিক্রয় বা বিনিময় করতে হয়। ইসলামে এ বিনিময়ের ব্যাখ্যা এবং নীতি ও বিধি-বিধান দেয়া হয়েছে।

ইসলামে সম্পদ বিনিময় নীতি নৈতিক বিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এ নীতির বাইরে গিয়ে যে বিনিময় হবে– তা হবে অবৈধ। ইসলামের বিনিময় নীতির কয়েকটি দিক হল–

১. জবরদস্তিমূলক বিনিময় অবৈধ

অন্যায় ও নির্যাতনমূলক এবং কারও ওপর চাপ সৃষ্টি করে এ ধরনের বিনিময় ইসলামে অবৈধ।

২. মজুদদারী ও মুনাফাখোরী অবৈধ

জনগণের সুবিধা-অসুবিধার দিকে খেয়াল না করে মজুদদারী, ব্যবসায়-বাণিজ্যে একচেটিয়াবাদ বৈধ নয়।

৩. প্রতারণা জঘন্য অপরাধ

মাপে কম-বেশি করা, প্রতারণা এবং অন্যান্য অসদুপায় অবলম্বন করা জঘন্য অপরাধ।

৪. সৎভাবে বিনিময় হালাল

সৎভাগে ব্যবসায় বাণিজ্য করা হালাল।

৫. সুদের মাধ্যমে বিনিময় হারাম

সুদের লেন-দেন করা হারাম। কারণ এটি একটি অন্যায় ও নির্যাতনমূলক অর্থ ব্যবস্থা। কুরআন মাজীদে ঘোষণা করা হয়েছে ,

اَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا

"আল্লাহ তা'আলা ক্রয়-বিক্রয় বা ব্যবসায়-বাণিজ্য হালাল করেছেন, আর সুদকে হারাম করেছেন।" (সূরা বাকারা : ২৭)

রাসূল (স) বলেন, "সুদখোর, সুদদাতা, এর লেখক ও সাক্ষী অভিশপ্ত।"

৬. সঞ্চয় করে রাখা অবৈধ

সম্পদ একস্থানে জমা করে রাখা বা কয়েকটি পরিবারের মধ্যে তা সীমাবদ্ধ করে ফেলা শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

৭. ঘুষ-উৎকোচ অবৈধ

মানুষ থেকে ঘুষ বা উৎকোচের মাধ্যমে টাকা পয়সা লেন-দেন হারাম।

ইসলামের সম্পদ বিনিময় নীতি খুবই পরিশীলিত ও পূত-পবিত্র। এ নীতি মেনে চললে সমাজে শান্তি-সমৃদ্ধি অর্জিত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৯.৪

ক. নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন : সঠিক উত্তর বেছে নিন।

১. ইসলাম বৈরাগ্যবাদের কর্ম / ধর্ম নয়।

২. ফজর সালাতের পর জীবিকা অর্জন না করে অলসভাবে ঘুমা নিষেধ করা হয়েছে। ঘুমাতে বলা হয়েছে।

৩. ভূমি ব্যবহার না করে ফেলে রাখায় দোষ, নেই / ফেলে রাখা অবৈধ।

৪. ইসলাম শ্রমকে সম্মানের / অসম্মানের মনে করে।

৫. আল্লাহ সুদকে বৈধ করেছে / অবৈধ করেছেন।

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার উৎপাদনের মূলনীতি বর্ণনা করুন।

২. ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার সম্পদের ভোগ ও ব্যবহারের নীতি উল্লেখ করুন।

৩. ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায় সম্পদের বিনিময় নীতি কী? আলোচনা করুন।

পাঠ ৫ ইসলামী অর্থব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় আয়ের উৎস

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- রাষ্ট্রীয় আয়ের বিভিন্ন উৎস সম্পর্কে বলতে পারবেন
- ভূমি রাজস্ব সম্পর্কে আলোকপাত করতে পারবেন
- রাষ্ট্রীয় আয়ের উৎস হিসেবে যাকাতের ভূমিকা উল্লেখ করতে পারবেন
- খুমুস সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন
- রাজস্ব আয়ের বিবিধ খাতের উল্লেখ করতে পারবেন।

৫.১ ইসলামী অর্থব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় আয়

ইসলামী রাষ্ট্র একটি জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান। কোন রাষ্ট্রই অর্থসম্পদ ছাড়া চলতে পারে না। ইসলামী রাষ্ট্র তার জনকল্যাণ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রতিরক্ষা, ব্যক্তিগত ভাতা, প্রশাসনিক ব্যয়, আপদকালীন ব্যয় ইত্যাদি খাতে অনেক অর্থ ব্যয় করে থাকে। সুতরাং ইসলামী রাষ্ট্রকে এ সব ব্যয় সংকুলানোর জন্য অর্থ সংস্থান করতে হয়। ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় আয়ের প্রধান উৎসগুলো হচ্ছে– যাকাত, উশর, খারাজ, সাদাকা, খুমুস ইত্যাদি।

ইসলামী রাষ্ট্রের আয়ের প্রধান উৎস

১. ভূমি রাজস্ব

রাষ্ট্রের সকল প্রকার ভূমির ভোগ-ব্যবহারের বিনিময়ে রাষ্ট্র নাগরিকদের কাছ হতে যে 'কর' আদায় করে, তাকে ভূমি রাজস্ব বলে। ভূমি রাজস্ব দু'প্রকার :

ক. উশর: যে ভূমির মালিক মুসলমান এবং প্রাকৃতিক উপায়ে ফসল উৎপন্ন হয়, সে সব জমির উৎপাদিত ফসলের এক দশমাংশ (১০%) কর যাকাত হিসেবে দিতে হয়। আর যে জমিতে ফসল উৎপন্ন করতে কৃত্রিমভাবে সেচ করতে হয়, সে সব জমির ফসলের ২০ ভাগের একভাগ (৫%) হারে 'কর' দিতে হয়। একে উশর বলে।

খ. খারাজ : ইসলামী রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিকদের জমির উৎপন্ন ফসলের 'কর'কে খারাজ বলে। খারাজের হার নির্ধারিত নয়। অবস্থাভেদে রাষ্ট্র প্রধান তা নির্ধারণ করেন।

২. যাকাত

ইসলামী রাষ্ট্রের রাজস্বের প্রধান উৎস যাকাত। সামর্থবান মুসলিমের সঞ্চিত সম্পদের ওপর যাকাত ধার্য করা হয়। বিভিন্ন সম্পদের ওপর বিভিন্ন হারে যাকাত দিতে হয়। যেমন -

ক. স্বর্ণ-রৌপ্য : কোন ব্যক্তির কাছে ৭.৫০ তোলা স্বর্ণ বা ৫২.৫০ তোলা রূপা বা এ পরিমাণ অর্থ এক বছর কাল থাকে, তবে তাকে ২.৫০% যাকাত আদায় করতে হয়।

খ. পশুর যাকাত : ৫টি উট থাকলে ১টি এক বছরের বকরী, ২০টি গরু থাকলে ১টি গরু, ৪০টি ছাগল/ভেড়া থাকলে ১টি বকরী যাকাত হিসেবে দিতে হয়।

গ. নগদ অর্থ / ব্যবসায়িক পণ্য : ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে কোন পণ্যের মূল্য যদি নিসাব পরিমাণ হয় বা নগদ অর্থ যদি নিসাব পরিমাণ থাকে, তা হলে তা থেকে ২.৫০% যাকাত আদায় করতে হয়।

৩. খুমুস : (পাঁচ ভাগের এক ভাগ)

যে সব সম্পদের এক পঞ্চমাংশ 'কর' হিসেবে আদায় করতে হয়, তাকে খুমুস বলে। খুমুস-এর সম্পদ হচ্ছে–

ক. গণীমতের মাল : কাফির-মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়ী হবার পর মুসলমানদের হাতে যেসব যুদ্ধলব্ধ সম্পদ আসে, তাকে গণীমতের মাল বলে। এ থেকে পাঁচ ভাগের এক ভাগ (২০%) রাষ্ট্রীয় তহবিলে জমা দিতে হয়।

খ. ফাই বা বিনা যুদ্ধে প্রাপ্ত সম্পদ : কাফির-মুশরিকদের কাছ থেকে বিনা যুদ্ধে যে সম্পদ পাওয়া যায়, তার পাঁচ ভাগের এক ভাগ রাজস্ব হিসেবে জমা দিতে হয়।

গ. খনিজ সম্পদ : প্রাপ্ত খনিজ সম্পদ বা গুপ্তধনের পাঁচ ভাগের এক ভাগ রাজস্ব হিসেবে জমা দিতে হবে।

ঘ. সামুদ্রিক সম্পদ : আহরিত যাবতীয় সামুদ্রিক সম্পদের পাঁচ ভাগের এক ভাগ রাজস্ব হিসেবে আদায় করতে হয়।

৪. মালিকানাবিহীন সম্পদ :

যে সব সম্পদের মালিক বা উত্তরাধিকারী নেই, সে সব সম্পদ রাষ্ট্রের বায়তুল মালে জমা করা হয়।

৫. বিবিধ খাত

উল্লিখিত খাত ছাড়া রাজস্ব হিসেবে আরও কতিপয় খাত আছে। সেগুলো হল -

ক. জিযিয়া কর : ইসলামী রাষ্ট্রের অনুগত অমুসলিম স্বচ্ছল নাগরিকদের নিকট হতে রাষ্ট্রের প্রয়োজন মেটাবার উদ্দেশ্য এবং তাদের জীবন-সম্পদসমূহের হেফাযতের জন্য নির্ধারিত 'কর' কে জিযিয়া বলে।

খ. বনজ সম্পদ : বনে-জঙ্গলে যেসব প্রাকৃতিক বনজ সম্পদ আছে- তাও রাষ্ট্রের সম্পদ।

গ. সাদাকাতুল ফিতর : রমযান মাসের শেষে ঈদের দিন প্রত্যেক সামর্থ্যবান মুসলিমের ওপর পরিবার ভুক্ত সকল সদস্যর মাথাপিছু নির্ধারিত সাদকাতুল ফিতর আদায় করতে হয়। এটাও রাষ্ট্রের আয়।

ঘ. আমদানী-রপ্তানী শুল্ক : খলীফা ওমর (রা)-এর খিলাফতকালে এ প্রকার 'কর' ধার্য করা হয়। তিনি মুসলিম নাগরিকদের কাছ থেকে ২.৫০%, জিম্মীদের কাছ থেকে ৫% এবং অমুসলিম ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে তাদের নিজেদের দেশে যে হারে শুল্ক আদায় করা হয়, সে হারে 'কর' আদায়ের নির্দেশ দেন। এটাই আমদানি-রপ্তানি শুল্ক।

ঙ. জরুরি পরিস্থিতিতে 'কর' : ইসলামী রাষ্ট্রের 'বায়তুল মাল' যদি হঠাৎ করে শূন্য হয়ে যায়। অথবা প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা করার জন্য অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন হয়। কিংবা বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য অর্থের প্রয়োজন হয়; তখন রাষ্ট্র তার নাগরিকদের কাছে নতুন 'কর' আরোপ করতে পারে।

চ. সামরিক কর : সামরিক প্রয়োজনে ইসলামী রাষ্ট্র প্রয়োজন মাফিক নাগরিকদের থেকে সামরিক কর আদায় করতে পারে।

সার-সংক্ষেপ

ইসলামী রাষ্ট্র একটি জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র। এ রাষ্ট্র জনগণের কল্যাণে 'কর' ধার্য করে থাকে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত 'কর' আদায় করে না। এসব 'কর' রাষ্ট্র তার নাগরিকদের সুখ-শান্তি সমৃদ্ধির জন্য ব্যয় করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৯.৫

ক. নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন : এক কথায় উত্তর দিন।

১. ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় আয়ের উৎসগুলো কী কী?
২. ভূমির ভোগ-ব্যবহারের বিনিময়ে রাষ্ট্র নাগরিকদের থেকে লোক 'কর' আদায় করে?
৩. উশর কী?
৪. খারাজ কী?
৫. স্বর্ণের নিসাবের পরিমাণ কী?
৬. পশুর যাকাতের নিসাব কী?
৭. খুমুস কী?
৮. গনিমতের মাল কী?
৯. সমুদ্র থেকে আহরিত সামুদ্রিক সম্পদের যাকাতের পরিমাণ কত?
১০. 'জিযিয়া কার' কী?

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. রাষ্ট্রীয় আয়ের বিভিন্ন উৎস সম্পর্কে বর্ণনা করুন।
২. ভূমি রাজস্ব কী কী?
৩. যাকাতের নিসাব কী কী?
৪. কোন কোন সম্পদে 'খুমুস' আদায় করতে হয়?
৫. রাষ্ট্রীয় আয়ের খাত কী কী উল্লেখ করুন।

ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায় যাকাতের ভূমিকা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- যাকাত কাকে বলে, তা বলতে পারবেন।
- ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায় যাকাতের গুরুত্ব ও ভূমিকা নিরূপণ করতে পারবেন।

৬.১ যাকাত কাকে বলে?

'যাকাত' শব্দের আভিধানিক অর্থ পূত-পবিত্রতা, পরিশুদ্ধি-পরিচ্ছন্নতা, ক্রম-বৃদ্ধি ও বেড়ে যাওয়া। যাকাত দান করলে অবশিষ্ট সম্পদ পবিত্র হয়, পরিমাণে বেড়ে যায়- তাই একে যাকাত বলা হয়।

ইসলামের শরীয়তের পরিভাষায়– কোন সাহিবে নিসাব মুসলমানের অর্থাৎ নিজ ও নিজের পরিবার-পরিজনের প্রয়োজনীয় বাৎসরিক ব্যয় মেটানোর পর বছর শেষে যদি কমপক্ষে সাড়ে সাত তোলা সোনা বা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপা অথবা তার সমপরিমাণ অর্থ-সম্পদ থাকে। উক্ত সম্পদের শতকরা (২.৫%) শরীয়তের নির্ধারিত আটটি খাতে প্রদান করাকে যাকাত বলা হয়।

প্রত্যেক 'সাহিবে নিসাব' মুসলমানের ওপর যাকাত আদায় করা ফরয। সোনা-রূপা, কারেন্সী, জমির ফসল, ব্যবসায়ের পণ্যদ্রব্য, গৃহপালিত গবাদি পশু, গরু-ছাগল, উট, মহিষ, ভেড়া-দুম্বা ইত্যাদি নির্দিষ্ট পরিমাণে পৌঁছলে যাকাত দিতে হয়।

যাকাত ইসলামী অর্থব্যবস্থার মেরুদণ্ড। যাকাত ইসলামের তৃতীয় রুকন বা স্তম্ভ। ঈমান ও নামাযের পরই এর স্থান। যাকাত অর্থনৈতিক ইবাদত। মহানবী (স) যাকাতকে ইসলামের সেতুবন্ধন বলেছেন। জাতীয় জীবনের বহু কিছু এ যাকাতের ওপর নির্ভরশীল। সুতরাং ইসলামী অর্থনীতিতে যাকাতের গুরুত্ব ও ভূমিকা অত্যন্ত ব্যাপক ও সুবিস্তৃত।

৬.২ ইসলামী অর্থনীতিতে যাকাতের ভূমিকা

যাকাত ইসলামী অর্থনীতির মেরুদণ্ড ও চালিকা শক্তি। জাতীয় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের এক বিরাট অংশ যাকাতের ওপর নির্ভরশীল। আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও অভাবমুক্ত সমাজ গঠনে যাকাত ব্যবস্থা সুদূরপ্রসারী ভূমিকা পালন করে। ইসলামী অর্থনীতিতে যাকাতের ভূমিকা নিম্নরূপ :

১. জাতীয় আয় বা বায়তুল মাল গঠনে

যাকাত ইসলামী রাষ্ট্রের বায়তুলমাল বা জাতীয় আয়ের একটি অন্যতম উৎস। 'সাহিবে নিসাব' ধনী ব্যক্তিরা তাদের সম্পদের শতকরা আড়াই ভাগ (২.৫০%) জাতীয় যাকাত তহবিলে প্রদান করে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ভিত্তি মজবুত করতে পারেন।

২. অর্থনৈতিক ভারসাম্য গঠনে

ধনী-গরীবের মধ্যে যে বিশাল অর্থনৈতিক ব্যবধান, তা যাকাতের মাধ্যমে দূর করা যায়। যাকাতের মাধ্যমে ধনী-গরীবের মধ্যে অর্থনৈতিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করা যায়। এ জন্যই মহানবী (স) "যাকাতকে ইসলামের সেতু বন্ধন" বলেছেন।

৩. সার্বজনীন অর্থনৈতিক নিরাপত্তায়

যাকাত সার্বজনীন অর্থনৈতিক প্রয়োজন পূরণ করে। মানুষের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। অক্ষম ও অসমর্থ সকল মুসলিমকেই যাকাতের অর্থ দিয়ে পুনর্বাসন করা যায়। যাকাতের অর্থ ব্যয়ের আটটি খাত পর্যালোচনা করলে এ সার্বজনীন অর্থনৈতিক নিরাপত্তার দিকটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যেমন–

ক. নিঃস্ব গরীবদের সাহায্য ও জীবিকার বন্দোবস্ত

খ. অভাবীদের সাহায্য ও জীবিকার বন্দোবস্ত

গ. প্রশাসনিক ব্যয় নির্বাহ

ঘ. দাস মুক্ত করা তথা স্বাধীনতা রক্ষায়

ঙ. ঋণ মুক্তকরণ

চ. নও মুসলিমদের সাহায্য ও পুর্নবাসন

ছ. পথিক মুসাফিরদের কল্যাণে

জ. আল্লাহর পথে, শিক্ষার উন্নয়নে, কল্যাণমূলক, সামাজিক কাজে ও যুদ্ধ-জিহাদের ব্যয় নির্বাহের জন্যে যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যায়।

কুরআন নির্দেশিত এ আটটি খাতকে সম্প্রসারিত করে যাকাতের অর্থ আরও ব্যাপকায়তনে জাতীয় অর্থনৈতিক প্রয়োজন পূরণে কাজে লাগানো যায়। সুতরাং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে যাকাতের ভূমিকা সুবিশাল ও সুবিস্তৃত।

৪. অভাব-অনটন বিমোচনে

যাকাত অভাবগ্রস্ত, গরীব-দুঃখী, আর্ত-মানবতার সেবায় ও অভাব-অনটন বিমোচনে এবং তাদের জীবিকা যোগানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৫. কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে

যাকাতের অর্থ দিয়ে নতুন নতুন কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি করা যায়। যাকাতের অর্থে মিল-কলকারখানা ও শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে গরীব-বেকারদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা যায়। ভিক্ষা বৃত্তি একটি সামাজিক অভিশাপ। ইসলাম ভিক্ষা বৃত্তিকে মোটেও পছন্দ করেনা। যাকাতের অর্থ দিয়ে কর্মসংস্থান গড়ে তোলে ভিক্ষাবৃত্তি উচ্ছেদ করা যায়। ভিক্ষুকের হাতকে কর্মীর হাতে রূপান্তর করা যায়।

যাকাত মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের চাবিকাঠি। জনশক্তি উন্নয়নে যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যায়। ফলে জাতীয় আয় বৃদ্ধিতে তারা কাজ করতে পারে। কাজেই আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে যাকাতের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

৬. ঋণ মুক্তিতে

যাকাতের অর্থ দিয়ে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রকে ঋণমুক্ত করা যায়।

৭. সম্পদের ক্রম বৃদ্ধি

যাকাত প্রদানের ফলে অর্থ কোথাও জমা হয়ে থাকতে পারেনা। অগণিত মানুষের হাতে অর্থ পৌছে যায়। ফলে মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বাড়ে। বাজারে চাহিদা বাড়লে উৎপাদন বাড়ে। উৎপাদন বাড়লে কর্মসংস্থান বাড়ে। ফলে বেকারত্ব দূর হয়। এভাবে যাকাত ইসলামী সমাজে কর্ম, ভোগ, উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করে।

৮. অর্থনৈতিক বন্ধাত্ব দূর করে

যাকাত পুঁজিবাদ ও মজুদদারের আপোষহীন শত্রু। যাকাত অর্থ-সম্পদকে অলসভাবে মওজুদ করে রাখার মানসিকতাকে বিনাশ করে। সঞ্চিত সম্পদ বিনিয়োগ করার জন্য বলিষ্ঠ প্রেরণা যোগায়। ফলে অর্থনৈতিক বন্ধাত্ব দূর হয়ে যায়।

৯. অর্থনৈতিক অপচয় রোধ

যাকাতের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং যাকাতের অর্থ ব্যয় করার খাতসমূহ নির্ধারিত করা আছে। কাজেই এক্ষেত্রে অপচয়ের কোন সম্ভাবনা নেই।

১০. অর্থনৈতিক ফাঁকি প্রতারণা বন্ধ করে

আধুনিক কর ব্যবস্থার মতো যাকাতের ব্যাপারে ফাঁকি দেয়ার প্রবণতা নেই। মানুষ ধর্মীয় অনুভূতি নিয়ে স্বেচ্ছায় যাকাত দিয়ে থাকে। যাকাত হচ্ছে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আল্লাহর কাছে মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত আনুগত্য। সুতরাং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে ফাঁকি ও প্রতারণা দূর করার ক্ষেত্রে যাকাতের ভূমিকা সীমাহীন।

১১. ধনী-গরীবের বৈষম্য দূর

যাকাতের মাধ্যমে সমাজে ধনী ও গরীবের মধ্যে আকাশচুম্বী বৈষম্য আস্তে আস্তে কমে যায়। তাদের মধ্যে আর্থ-সামাজিক সমতা সৃষ্টি হয়। ফলে যাকাতের মাধ্যমে ধনী-গরীবের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ ও মৈত্রীর বন্ধন সৃষ্টি হয়। ধনীরা সমাজের অর্থনৈতিকভাবে যারা দুর্বল হয়ে পড়েছে তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়। গরীবরাও ধনীদেরকে আপন ও বন্ধু ভাবে। পরস্পর বিপদে-আপদে এগিয়ে আসে এবং পরস্পরের মধ্যে সহানুভূতি সৃষ্টি হয়। তখন সমাজ হয় শান্তি ও সুখময়।

১২. অর্থের অহমিকা দূর হয়

যাকাত প্রদানের ফলে মানুষের মন থেকে অর্থের লোভ-মোহ, অহমিকা এবং অহংকার দূর হয়ে যায়। কেননা, যাকাত প্রদানের দ্বারা সে বুঝতে পারে ধনসম্পদ আল্লাহর দেয়া জিনিস। তিনি ইচ্ছা করলে তা কেড়েও নিতে পারেন। তাই যাকাত দিতে পারায় সে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং আত্মায় শান্তি আসে।

১৩. সমাজকল্যাণ ও জনহিতকর কাজে

যাকাতের অর্থ দিয়ে সমাজের মানুষের আর্থ-সামাজিক ভাগ্য উন্নয়নে এবং বহু সমাজকল্যাণ ও জনহিতকর কাজ করা যায়।

১৬. পুঁজিবাদ ধ্বংসের হাতিয়ার

যাকাত ইসলামী অর্থনীতিতে পুঁজিবাদ ধ্বংসের প্রধান হাতিয়ার। যাকাত দিলে পুঁজিবাদী মানসিকতা থাকে না। সম্পদ পুঁঞ্জীভূত করার খেয়াল থেকেই যাবতীয় অনাচারের সৃষ্টি হয়, যাকাত সে পথও বন্ধ করে।

ভোগে শান্তি নয় বরং ত্যাগেই শান্তি। যাকাতের মাধ্যমে অর্থ ব্যয় ও দানের মানসিকতা গড়ে ওঠে এবং বিত্তবান ব্যক্তিরা ত্যাগ স্বীকারে উদ্বুদ্ধ হয়।

মওজুদকৃত সম্পদ বছরের পর বছর এক জায়গায় পুঞ্জীভূত থাকার ফলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যাহত হয়। তার সাথে সাথে সম্পদের বিরাট অংশ নষ্ট হয়ে যায়। যাকাতের ফলে সম্পদের মালিক সচেতন হয় এবং ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে।

সার-সংক্ষেপ

যাকাত ইসলামী অর্থনীতির মেরুদণ্ড ও চালিকা শক্তি। আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও সুখী-সমৃদ্ধশালী আদর্শ সমাজ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে যাকাতের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৯.৬

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন : সঠিক উত্তরটি লিখুন।

১. যাকাত শব্দের অর্থ-
   ক. পূত-পবিত্রতা খ. পরিশুদ্ধি ও পরিচ্ছন্নতা
   গ. ক্রম-বৃদ্ধি ও বেড়ে যাওয়া ঘ. সব কটি ঠিক।

২. প্রয়োজনীয় বাৎসরিক ব্যয় মেটানোর পর কত সম্পদ থাকলে যাকাতের সাহিবে নিসাব হয়?
   ক. সাড়ে বায়ান্ন তোলায় রূপা খ. সাড়ে সাত তোলা সোনা
   গ. বা সমপরিমাণ অর্থ থাকলে
   ঘ. সব কটি ঠিক।

৩. "সাহিবে নিসাব" পরিমাণ সম্পদ থাকলে কী পরিমাণ যাকাত দিয়ে হয়?
   ক. ২.৫% ভাগ খ. ১০% ভাগ
   গ. ৫% ভাগ ঘ. ৪০% ভাগ

৪. যাকাত ব্যয়ের নির্ধারিত খাত কয়টি?
   ক. পাঁচটি খ. নয়টি
   গ. আটটি ঘ. দশটি

৫. মহানবী (স) যাকাত কে ইসলামের কী বলে অভিহিত করেছেন?
   ক. ইসলামের সেতু বন্ধন খ. ইসলামের ফরয
   গ. ঢাল স্বরূপ ঘ. ইবাদত

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. যাকাত বলতে কী বুঝায়?
২. ইসলামী অর্থ নীতিতে যাকাতের ভূমিকা কী?
৩. "সর্বজনীন অর্থনৈতিক নিরাপত্তায় যাকাতের ভূমিকা অনন্য", ব্যাখ্যা করুন।
৪. "যাকাত পুঁজিবাদ ধ্বংসের হাতিয়ার"- বিশ্লেষণ করুন।
৫. "যাকাত ধনী-গরীবের মধ্যে বৈষম্য কমায়"- আলোচনা করুন।

যাকাতের নিসাব ও যাকাত ব্যয়ের খাতসমূহ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- যাকাতের নিসাব বর্ণনা করতে পারবেন।
- যাকাত ব্যয়ের নির্ধারিত কাতসমূহ উল্লেখ করতে পারবেন।

৭.১ যাকাতের নিসাব

যে পরিমাণ সম্পদ থাকলে যাকাত ফরয হয়, তাকে নিসাব বলে। অর্থাৎ "হাওয়াইজে আসলিয়া" বা মৌলিক প্রয়োজন বাদে যে পরিমাণ সম্পদ এক বছরকাল মালিকের নিকট থাকলে যাকাত ফরয হয়, তাকে যাকাতের নিসাব বলা হয়। যার নিছাব আছে তাকে 'মালিকে নিসাব' বা 'সাহিবে নিসাব' বলে।

গৃহপালিত পশু, স্বর্ণ, রৌপ্য, ব্যবসায়ের মালামাল, ভূমিতে উৎপন্ন ফসল, গুপ্তধন প্রভৃতির ওপর যাকাত ধার্য হয়। এসব সম্পদের নিসাবের পরিমাণ শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত আছে।

৭.২ সোনা-রোপার যাকাত

সোনা ও রূপা দুটো উত্তম খনিজ সম্পদ। আল্লাহ তা'আলা এ দু'টোর মধ্যে অনেক কল্যাণ রেখেছেন, যা অপরাপর খনিজ সম্পদে দেখা যায় না। এ দু'টো সম্পদের অপ্রতুলতা ও উত্তমতার কারণে সুপ্রাচীনকাল থেকেই বহু জাতি এ দু'টো ধাতু দ্বারা নগদ সম্পদ বা মুদ্রা বানিয়েছে ও দ্রব্যমূল্যের মান হিসেবে গ্রহণ করেছে। এ দু'টো সম্পদ স্বতঃই বর্ধনশীল সম্পদরূপে গণ্য হয়ে এসেছে। তাই ইসলামী শরীয়ত এর ওপর যাকাত ফরয করেছে। তা নগদ সম্পদ হয়ে থাকুক বা খনিজ দ্রব্য হয়েই থাকুক। তা দিয়ে পাত্র উপঢৌকন, ব্যবহার্য অলংকার বানানো হলেও তাতে যাকাত ধার্য হবে। সোনা ও রূপার পরিমাণ ও পরিমাপ সংক্রান্ত প্রাচীন একক যেমন রতল, কিরাত, মিসকাল, আউকিয়া, কায়ল, ওজন, দিরহাম প্রভৃতি নিয়ে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন কথা আছে। আমরা এখনে হানাফী মাযহাবের বক্তব্যর সার কথা তুলে ধরছি।

(ক) সোনার নিসাব

সোনার নিসাব হচ্ছে ২০ মিসকাল (Ounce) (বিশ মিসকাল স্বর্ণের কম পরিমাণে কোন যাকাত নেই)। আমাদের দেশে প্রচলিত ওজন অনুযায়ী ২০ মিসকাল হচ্ছে সাড়ে সাত ভরি বা তোলার সমপরিমাণ। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রচলিত মেট্রিক পদ্ধতিতে ১ তোলা = ১১.৬৬ গ্রাম। এবং সাড়ে সাত তোলা/ভরি = ৮৭.৪৫ গ্রাম। সুতরাং ৮৭.৪৫ গ্রাম পরিমাণ সোনা এক বছর ব্যাপী যার মালিকানায় থাকবে, তার ওপর যাকাত ফরয হবে। সোনা পিণ্ড আকারে, বাসন-কোসন রূপে, অলংকার হিসেবে, মুদ্রা রূপে বা সোনার তরবারি হিসেবে বা অন্য যেকোন অবস্থায়ই থাকুক না কেন মালিকানায় ৮৭.৪৫ গ্রাম সোনা থাকলেই যাকাত ফরয হবে। এ সবের বানানোর মূল্য হিসেব করে শতকরা (২.৫%) ভাগ হিসেবে যাকাত আদায় করতে হবে।

(খ) রূপার নিসাব

রূপার যাকাতের নিছাব হচ্ছে সর্বসম্মতিক্রমে ২০০ দিরহাম। আমাদের দেশের প্রচলিত ওজনে এর পরিমাণ সাড়ে বায়ান্ন তোলা বা ভরি। আন্তর্জাতিক মেট্রিক পদ্ধতি অনুসারে সাড়ে বায়ান্ন তোলা = ৬১২.৫৩ গ্রাম রূপা। কমপক্ষে ৬১২.৫৩ গ্রাম রূপা যার মালিকানায় এক বছর ধরে আছে তার ওপর যাকাত ফরয। রূপা পিণ্ড আকারে, অলংকার রূপে, ব্যবসায়ের পণ্য হিসেবে, রৌপ্য খচিত তরবারি রূপে বা তৈজসপত্র আকারে, রূপার মুদ্রারূপে বা অন্য যেকোন অবস্থায় থাকুক না কেন; নিসাব পরিমাণ হলেই যাকাত ধার্য হবে। আর এসবের বানানোর মূল্য হিসাব করে শতকরা (২.৫) ভাগ যাকাত দিতে হবে।

৭.৩ যাকাত বন্টনের খাতসমূহ

যাকাত প্রদানের নির্দিষ্ট খাত বা ক্ষেত্র আছে। যাকাতের অর্থ সম্পদ সে সব নির্দিষ্ট খাতেই ব্যয় করতে হবে। অন্যথা যাকাত আদায় হবে না। যাকাত প্রদানের খাতকে ইসলামী পরিভাষায় মাসারিফ বলা হয়। পবিত্র কুর'আনে যাকাত প্রদানের আটটি খাত উল্লেখ করা হয়েছে।

যাকাতের মাসারিফ বা যাকাত যারা পাবে তাদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ ঘোষণা করেন -

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

"যাকাত প্রাপক হচ্ছে দরিদ্র, মিসকীন, যাকাত আদায়কারী কর্মচারী, যাদের মন আকর্ষণ করা প্রয়োজন, বন্দী, ঋণগ্রস্থ, যারা আল্লাহর রাস্তায় আছে, যারা পথিক। এসব আল্লাহর নির্ধারিত ফরয। আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও বিজ্ঞানময়।" (সূরা তাওবা : ৬০)

কুরআনের এ আয়াতে যাকাত প্রাপকগণকে ৮টি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে।

১. ফকীর

যাদের সামান্য অর্থ আছে, যা নিছাব পরিমাণ নয়। এদেরকে যাকাত দেওয়া যাবে।

২. মিসকীন

যাদের কিছুই নেই, নিঃস্ব। এদেরকেও যাকাতের সম্পদ দিতে হবে।

৩. যাকাত আদায়কারী

সরকারের পক্ষ থেকে নিযুক্ত যাকাত আদায়কারী। এদের পারিশ্রমিক যাকাতের অর্থ থেকে দিতে হবে। অর্থাৎ যাকাতের প্রশাসনিক ব্যয় নির্বাহ করা যাবে।

৪. মুয়াল্লাফাতুল কুলুব

এ আয়াতের মধ্যে Ë«‰‡Â‡ƒ‰‡·‡…†‚‡‰‡Ë»‡Á‡Â অর্থাৎ নওমুসলিমদের মন খুশী করার জন্য মহানবী (স) যাকাতের অর্থ দান করতেন। বর্তমানে নও মুসলিমদের পুণর্বাসন খাতে এ অর্থ ব্যয় হবে।

৫. দাসত্ব মুক্তির জন্য

দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করার জন্য যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যাবে। বিশেষ করে মুকাতাব শ্রেণীর ক্রীতদাস– যারা অর্থ প্রদানে মুনিবের কাছ থেকে মুক্তি পাবে বলে চুক্তিতে আবদ্ধ। তার দাসত্ব মোচনে অর্থ দরকার। এদেরকে যাকাতের অর্থ প্রদান করা যাবে।

৬. ঋণী ব্যক্তি

যার ঋণ পরিশোধ করার ক্ষমতা নেই। যাকাতের অর্থ দিয়ে ঋণ শোধ করার অর্থ যোগান দেয়া যাবে।

৭. ফী সাবীলিল্লাহ

যারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে অর্থাভাবে শরীক হতে পারছে না। অর্থাৎ আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন সংক্রান্ত তথা জিহাদের জন্য খরচ করা যাবে। তাছাড়া ইলম অন্বেষণকারীকে আল্লাহর সাথে সাধারণ খাতে যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যাবে।

৮. ভ্রমণকারী

এমন ভ্রমণকারী বা পর্যটক যিনি বিদেশে অর্থ সংকটে পতিত হয়েছে তাকে যাকাতের অর্থ দেয়া যাবে। তাছাড়া পথিকদের কল্যাণেও অনেক ব্যাপারে যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যাবে।

৭.৪ নিয়ম

মালিকে নিসাব উক্ত আটটি খাতে তার যাকাতের অর্থ প্রদান করতে পারেন। তবে যখন কোন দেশে ইসলামী সরকার কায়েম থাকে, তখন সরকার নিযুক্ত যাকাত আদায়কারী মালিকে নিসাবের নিকট থেকে বাধ্যতামূলকভাবে যাকাত আদায় করে তা উক্ত ৮টি খাতে বণ্টন করবেন।

যাকাতের অর্থ উক্ত সকল শ্রেণীর লোককে বা কোন এক শ্রেণীর এক ব্যক্তিকে প্রদান করা যায়। ইমাম শাফিঈ (র) এর মতে উক্ত ৮ শ্রেণীর প্রত্যেক শ্রেণীর অন্তত ৩ জন লোককে যাকাত দিতে হবে।

যাকাতের অর্থ মসজিদ নির্মাণ, মৃত ব্যক্তির জন্য কাফন কেনা, নিজের ঋণ পরিশোধ ও নিজের গোলাম আযাদ করার কাজে ব্যয় করা যাবে না।

পূর্ব পুরুষ বা বংশধর কেউ যাকাত পেতে পারে না। এ ছাড়া স্বামী স্ত্রী পরস্পর পরস্পরের যাকাত গ্রহণ করতে পারে না। হাশিম বংশীয়গণও যাকাত পাবে না।

সার-সংক্ষেপ

কুর'আনের নির্দেশিত যাকাতের অর্থ মানবতার অর্থনৈতিক প্রয়োজনে লাগানো যায়। যাকাত মানুষের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বিধান করে। অক্ষম ও অসমর্থ সকলকেই যাকাতের অর্থ দিয়ে পুনর্বাসন করা যায়। সুতরাং সর্বজনীন অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বিধানে যাকাতের ভূমিকা সুদূর প্রসারী ও সুবিস্তৃত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৯.৭

ক. নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন : এক কথায় উত্তর দিন-

১. যে পরিমাণ সম্পদ থাকলে যাকাত ফরয হয় তাকে কী বলে?

২. কি কি মালামালের ওপর যাকাত ধার্য হয়?

৩. দুটো উত্তম খনিজ সম্পদ কী কী? যার ওপর যাকাত ফরয হয়?

৪. সোনার নিসাব কতটুকু?

৫. রুপার নিসাব কতটুকু?

৬. যাকাত ব্যয়ের খাতকে আরবিতে কী বলা হয়?

৭. 'ফকীর' কাকে বলে?

৮. মিসকীন কারা?

৯. "মুয়াল্লাকাতুল কুলুব" অর্থ কী?

১০. 'ফী-সাবিল্লিাহ' বলতে কী বুঝায়?

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. যাকাতে নিসাব বলতে কী বোঝায়?

২. সোনা, রুপার যাকাতের নিসাব উল্লেখ করুন।

৩. যাকাত বন্টনের খাত কী কী?

৪. যাকাতের মাসারিফ ঘোষণার আয়তটি মুখস্থ বলুন এবং অর্থ লিখুন।

৫. যাকাত প্রদানের নিয়ম লিখুন।

উশর, খারাজ ও জিযিয়া

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায় উশর ও উশরের বিধান সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- খারাজ ও এর বিধান উল্লেখ করতে পারবেন।
- জিযিয়া কী ও এর বিধান বর্ণনা করতে পারবেন।

৮.১ উশর কী

মানুষের প্রতি আল্লাহর অপার অসীম নিয়ামত হিসেবেই তিনি এ পৃথিবীকে মানুষের জন্য সুসজ্জিত ও বাসোপযোগী বানিয়েছেন। এ যমীনকে উৎপাদনের ক্ষেত্র হিসেবে তৈরি করেছেন। মানুষের রিযক ও জীবন-জীবিকার প্রথম উৎস বানিয়েছেন এ যমীনকে। আল্লাহ পাক বলেছেন : "আমরাই তোমাদের প্রতিষ্ঠিত করেছি যমীনের বুকে এবং তাতেই সংরক্ষিত করেছি তোমাদের জন্য জীবন-জীবিকা। তা সত্ত্বেও তোমরা খুব সামান্যই শোকর কর।"

মহান আল্লাহর এ বিশাল নিয়ামত ও অনুগ্রহের জন্য আল্লাহ তায়ালা শোকর আদায় করতে হবে। আর সেই শোকর আদায়ের মাধ্যম হচ্ছে জমির উৎপন্ন ফসল থেকে যাকাত আদায় করা।

ইসলামী অর্থনীতির পরিভাষায় জমির উৎপন্ন ফসলের যাকাতকে 'উশর' বলা হয়। একে 'ফল ও ফসলের যাকাতও বলা যায়।

উশর বা জমির ফসলের যাকাতের নিসাব

মুসলমানদের জমির ফসলের যাকাত হচ্ছে উশর। জমিতে উৎপন্ন ফসল ও ফলের যাকাত কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা এবং যুক্তির ভিত্তিতে ফরয প্রমাণিত হয়েছে।

শরীয়তের বিধান অনুসারে জমির ফসলেরও যাকাত দিতে হবে। ফসলের যাকাতকে ইসলামে উশর বলা হয়। উশর আদায় করা সরকারের দায়িত্ব।

তবে জমির প্রকৃতির ওপর উশরের হারে তারতাম্য আছে। নদী-নালা অথবা বর্ষার পানি দ্বারা চাষাবাদ হলে এর উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ ৫ অসক বা ৫ মণ ২.৫০ সের বা ১৮৭.৩৩ কেজি বা তার চেয়ে বেশি হলে উশর আদায় করতে হবে। উশর আদায়ের ক্ষেত্রে বছর কোন শর্ত নয়। এক্ষেত্রে উশরের হার ১০%। ইমাম শাফি'ঈ (র), ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মত এটাই। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফার মতে উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ ১৮৭.৩৩ কেজির কম হলেও উশর আদায় করতে হবে। পার্বত্য অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত মধু এবং ফলে ও উশর আদায় করতে হবে।

যে জমিতে পানি সেচ করে ফসল ফলাতে হয়, সে জমির উৎপন্ন শস্যের যাকাত নিসফে উশর বা ৫%।

শাক-সবজির যাকাত : ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে জমিতে উৎপন্ন তরি-তরকারি ও শাক-সবজিরও যাকাত দিতে হবে। তবে এ যাকাত সরকার আদায় করবে না। তরকারি ও শাক-সবজির মালিক নিজেই দরিদ্রদের মাঝে তা বণ্টন করবে। জ্বালানি কাঠ, বাঁশ ও ঘাসের যাকাত দিতে হবে না।

৮.২ অমুসলিমের জমিতে খারাজ

একজন অমুসলিম কৃষককে তার জমিতে উৎপন্ন ফসলের জন্য সরকারকে উশর দিতে হয় না। তাকে দিতে হয় খারাজ। যাকাত ও উশর হচ্ছে আল্লাহর ইবাদত। কিন্তু খারাজ দাতার জন্য ইবাদত নয়।

মুসলমানদের চাষের জমিকে উশরী জমি বলা হয়। অমুসলমানদের চাষের জমিকে খারাজী জমি বলা হয়। মুসলমানের কাছ থেকে কোন অমুসলমান উশরী জমি ক্রয় করলে সে জমি খারাজী জমিতে পরিণত হয়।

খারাজী পানি-উশরী পানি

পানি দু'প্রকার খারাজী পানি ও উশরী পানি। খাল-বিল, ঝরণা ও বর্ষার পানি, টাইগ্রিস, ইউফ্রেটিস, আমুদরিয়া, শির দরিয়া প্রভৃতি নদীর পানি উশরী পানি। অনারবগণ যে সকল খাল কেটেছে সে খালের পানি খারাজী পানি। প্রাচীন ইরান সম্রাট ইয়াজদজর্দ কর্তৃক কাটা খাল তথা ইয়াজদজর্দ খালের পানি খারাজী পানি।

খারাজী পানি দ্বারা বাগানে সেচ করে যে ফসল ফলান হয়, তার জন্য একজন মুসলিম চাষীকেও খারাজ দিতে হবে। কিন্তু উশরী পানি দ্বারা বাগানে সেচ করলে উশর দিতে হবে।

ইসলামী রাষ্ট্রের আয়ের অন্যতম উৎস খারাজ। এটা অমুসলিমদের ভূমি কর। যে জমির মালিক কোন অমুসলমান কিংবা ইসলামী রাষ্ট্র যে জমি কোন অমুসলমানকে বন্দোবস্ত দিয়েছে, সে প্রকার জমিকে বলা হয় খারাজী জমি। আর এ খারাজী জমিতে যে রাজস্ব ধার্য করা হয় বা তা হতে যে রাজস্ব আদায় করা হয়; তাকে খারাজ বলে।

খারাজের বিধান

খারাজ নির্ধারণ করার পূর্বে ইসলামী রাষ্ট্রকে ভূমি বিশেষজ্ঞ দ্বারা অতি সতর্কতার সাথে ভূমির জরিপ কার্য সমাধান করতে হবে। ভূমির প্রকৃতি ও গুণাগুণ পরীক্ষা করে তার শ্রেণীবিভাগ এবং এমনভাবে খারাজ নির্ধারণ করতে হবে, যেন কারো ওপর অবিচার ও অত্যাচার করা না হয়। সুতরাং জমি, মাটির উর্বরতা, সেচ, শ্রম ইত্যাদির পার্থক্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে খারাজের হার ধার্য করতে হবে। খারাজের কোন নির্দিষ্ট হার নেই। এটা ইসলামী সরকার পরিবেশ পরিস্থিতি বিবেচনা করে ইনসাফের সাথে নির্ধারণ করবেন। সকল অমুসলিমের ওপরও এটা ধার্য হয় না। শুধু সামর্থবান অমুসলিমের ওপরই খারাজ ধার্য হয়।

৮.৩ ইসলামী রাষ্ট্রে সম্পদের খুমুস

ইসলামী রাষ্ট্রের আয়ের একটি উৎস খুমুস। খুমুস শব্দের অর্থ কোন বস্তুর এক পঞ্চমাংশ। ইসলামী অর্থনীতির পরিভাষায় এর অর্থ হচ্ছে সে সকল সম্পদের এক পঞ্চমাংশ যা ইসলাম বায়তুল মালে জমা দিতে নির্দেশ দিয়েছে। এ সকল সম্পদের মধ্যে যুদ্ধলব্ধ গনীমতের মাল, খনিজ ও ভূগর্ভ হতে প্রাপ্ত সম্পদ এবং সামুদ্রিক সম্পদ বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। যথা :

১. গনীমতের মাল

ইসলামী রাষ্ট্রের আয়ের অন্যতম উৎস হচ্ছে গনীমত। ইসলামী পরিভাষায় গনীমত বলা হয় অমুসলিমদের সাথে যুদ্ধ করে বিজয়লাভ করার পর রণক্ষেত্রে তাদের পরিত্যক্ত যে সম্পদ মুসলিম বাহিনীর হস্তগত হয় তাই গনীমতের মাল নামে অভিহিত। অস্ত্র-শস্ত্র, খাদ্য-সামগ্রী, যান-বাহন, পোশাক-পরিচ্ছদ, তৈজসপত্র প্রভৃতি যা কিছু পাওয়া যাবে তা সবই গনীমতের মাল বলে গণ্য হবে।

গনীমতের মালের বিধান : গনীমতের মালের এক পঞ্চমাংশ বা পাঁচ ভাগের এক ভাগ ইসলামী রাষ্ট্রের আয়ের অন্তর্ভুক্ত। ইসলামের প্রাথমিক যুগে মুসলিম সেনা বাহিনীর কোন নির্ধারিত বেতন-ভাতার ব্যবস্থা ছিল না। এ সময়ে গনীমতের মালের এক পঞ্চমাংশ নির্ধারিত খাতে ব্যয় করার জন্য বায়তুল মালে জমা করা হত আর অবশিষ্ট চার পঞ্চমাংশের ৫ ভাগের ৪ ভাগ সেনা বাহিনীর মধ্যে বণ্টন করা হতো।

২. খনিজ সম্পদ

প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে বিভিন্ন খনিজ সম্পদ মহান স্রষ্টার বিরাট অবদান। ইসলামী রাষ্ট্রের আয়ের উৎসগুলোর মধ্যে খনিজ সম্পদ অন্যতম। ইসলামী অর্থনীতির বিধান অনুযায়ী খনিজ সম্পদের এক পঞ্চমাংশ রাষ্ট্রীয় আয় খাতে জমা হবে। এতে ইসলামী রাষ্ট্রের বায়তুল মাল যথেষ্ট শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ হতে পারে। আর যেহেতু বায়তুল মাল জনগণেরই সম্পদ, সেহেতু তা দ্বারা জনসাধারণের প্রভূত কল্যাণ ও উন্নতি হতে পারে। এ সম্পর্কে ইমাম আবূ ইউসুফ (র) বলেছেন– "স্বর্ণ, রৌপ্য, তামা, লোহা, সীসা প্রভৃতি যা কিছু খনিতে পাওয়া যাবে, এরূপ যাবতীয় সম্পদ হতে এক পঞ্চমাংশ (ইসলামী রাষ্ট্রীয় আয় খাতে জমা করার জন্য) নির্ধারিত। "ভূগর্ভের সম্পদকে অর্থনীতির পরিভাষায় আরবীতে রিকায বলা হয়। এরও এক পঞ্চমাংশ রাষ্ট্রীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত। মহানবী (স) বলেছেন– "রিকাযের এক পঞ্চমাংশ রাষ্ট্রীয় আয় খাতে জমা হবে।"

৩. সামুদ্রিক সম্পদ

প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে সমুদ্র এবং সামুদ্রিক বিপুল সম্পদরাশি মহান আল্লাহরই দান। সুতরাং এটাও স্থলভাগের সম্পদের মতই মূল্যবান। তাই সামুদ্রিক সম্পদও ইসলামী রাষ্ট্রের আয়ের অন্যতম উৎস। মৎস্য, মুক্তা, প্রবাল এবং নানাবিধ উদ্ভিদ ও প্রস্তরাদির উপরও এক পঞ্চমাংশ কর ধার্য করতে হবে। তাছাড়া বড় বড় নদী-নালা, খাল-বিল, হাওড় প্রভৃতিতে মৎস্য চাষ হলে কিংবা প্রাকৃতিক মৎস্য ধৃত হলে, তাতে এক পঞ্চমাংশ রাজস্ব আদায় করতে হবে। এ সম্পর্কে হযরত ওমর (রা) বলেছেন॥ "মহান আল্লাহ সমুদ্রে যা কিছু উৎপাদন করেছেন, তা হতে এক পঞ্চমাংশ রাজস্ব খাতে জমা দিতে হবে।"

৮.৪ জিযিয়া কর

ইসলামী রাষ্ট্রের আয়ের একটি উৎস জিযিয়া। জিযিয়া অর্থ বিনিময়। ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত অমুসলিমদের অধিকার আদায়ে এবং তাদের নিরাপত্তা ও রক্ষণাবেক্ষণের নিশ্চয়তা বিধানের দায়িত্ব রাষ্ট্র গ্রহণ করে। এ দায়িত্ব পালনে রাষ্ট্র প্রয়োজন পরিমাণ যে 'কর' অমুসলিমদের নিকট হতে আদায় করে থাকে, তাই 'জিযিয়া কর'। এটাও রাষ্ট্রীয় আয়ের মধ্যে পরিগণিত। কেননা, ইসলামী রাষ্ট্রের নিকট হতে অমুসলিম নাগরিকগণ নিজ নিজ অধিকার আদায়ের দাবী রাখে, তেমনি রাষ্ট্রের প্রতি তাদের কিছু কর্তব্যও রয়েছে। এ কর্তব্য প্রধানত দুটো–

প্রথমত : ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতি তারা পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করবে।

দ্বিতীয়ত : প্রয়োজনে তারা সামর্থানুযায়ী অর্থ সাহায্য করবে।

জিযিয়া কেন ?

ইসলামী রাষ্ট্রের মুসলিম সম্প্রদায় যেমন যাকাত আদায় করবে, তেমনি তার অমুসলিম সম্প্রদায় জিযিয়া আদায় করবে। যাকাত যেমন বছরে একবার আদায় করা হয়, জিযিয়াও তেমনি বছরে একবার আদায় করা হয়ে থাকে। দেশ রক্ষা সংক্রান্ত কাজে ও জিহাদে অংশগ্রহণ প্রত্যেক সুস্থ ও সবল মুসলমানের অপরিহার্য কর্তব্য। কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্র অমুসলিম সম্প্রদায়কে এ কঠিন দায়িত্ব হতে মুক্ত রেখেছে। কেননা, এতে তারা জান-মালের নিরাপত্তার অভাব বোধ করতে পারে এবং তাদের প্রতি একটি যুলুম বা নির্যাতন হচ্ছে এরূপ ধারণা করতে পারে।

জিযিয়ার পরিমাণ

জিযিয়ার পরিমাণ কী হবে, তা ইসলামী রাষ্ট্র অমুসলিমদের অবস্থা ও সঙ্গতি দেখে নির্ধারণ করবে। এর কোন নির্দিষ্ট হার ইসলাম পূর্বেই নির্ধারণ করে দেয়নি। তবে সর্বদা লক্ষ্য রাখতে হবে, যেন কারো ওপর বোঝা হয়ে না দাঁড়ায়। কোনরূপ আর্থিক বা মানসিক নির্যাতন কিংবা পক্ষপাতিত্ব প্রকাশ না পায়। এ সম্পর্কে মহানবী (স) বলেছেন– "যে ব্যক্তি কোন চুক্তিবদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রতি নির্যাতন করবে, কিংবা তাদের সামর্থ্যের অতিরিক্ত কোনরূপ বোঝা তাদের ওপর চাপিয়ে দেবে, (হাশরের দিন) আমিই তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়ে দাঁড়াব।"

জিযিয়া কাদের প্রতি ধার্য হবে

অমুসলিম নাগরিকদের সকলের প্রতি জিযিয়া কর ধার্য করা যাবে না; বরং যারা সম্পদশালী ও উপার্জনক্ষম পুরুষ কেবল তাদের প্রতিই এ জিযিয়া ধার্য করা যাবে। দরিদ্র, দানগ্রহণ যোগ্য, উপাজর্নহীন বেকার, উপার্জনে অক্ষম বৃদ্ধ, রুগ্ন, পঙ্গু, অন্ধ প্রভৃতি অমুসলিম লোকের ওপর হতে ইসলাম জিযিয়া মওকুফ করে দিয়েছে।

এ থেকেই বুঝা যায়– ইসলামের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা কত সুবিচারপূর্ণ। সত্যি ইসলামী বিধান কত সুন্দর, কতই না মানবতার জন্য কল্যাণকর ব্যবস্থা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৯.৮

ক. নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন : শূন্যস্থান পূরণ করুন-

১. মানুষের রিযক ও জীবন-জীবিকার প্রথম উৎস হচ্ছে .....।
২. ইসলামী অর্থনীতির পরিভাষায় জমির উৎপন্ন ফসলের যাকাতকে ..... বলা হয়। একে ..... ও ..... এর যাকাত ও বলা হয়।
৩. যে জমিতে পানি সেচ করে ফসল ফলাতে হয়, সে জমির উৎপন্ন শস্যের ..... নিসফে ..... বা ৫%।
৪. জমিতে উৎপন্ন তরি-তরকারি ও শাক-শবজিরও ..... দিতে হবে।
৫. অমুসলিম কৃষকের জমির উৎপন্ন ফসলের জন্য দিতে হয় .....। এটা অমুসলিমদের ..... কর।
৬. ইসলামী রাষ্ট্রের মুসলিম সম্প্রদায় যেমন যাকাত আদায় করবে, তেমনি অমুসলিম সম্প্রদায় আদায় করবে ..... কর।

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. উশর কী? এর বিধান লিখুন।
২. খারাজ কী? খারাজের নিয়ম লিখুন।
৩. খুমুস কী? বিস্তারিত লিখুন।
৪. জিযিয়া কার বলতে কী বোঝায়? কোন অমুসলিম নাগরিকদের ওপর জিযিয়া কর ধার্য করা হয়?

ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায় সাদাকার ভূমিকা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- সাদাকা কী তা বলতে পারবেন।
- সাদাকাতুল ফিতর ও নফল সাদাকাত সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।
- সাদাকার ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবেন।

৯.১ সাদাকা

সাদাকা মানে দান। ইসলামী অর্থনীতিতে সাদাকার গুরুত্ব অপরিসীম। সাদাকা দু'প্রকার। নফল সাদাকা এবং ওয়াজিব সাদাকা। সকল প্রকার ঐচ্ছিক দানই নফল সাদাকা। মানতের সাদাকা এবং সাদাকাতুল ফিতর ওয়াজিব সাদাকা। সাদাকাতুল ফিতরই ইসলামী রাষ্ট্রের আয়ের উৎস।

সাদাকাতুল ফিতর

পবিত্র রমযান মাসের সিয়াম সাধনার পর ঈদের দিন ধনীগণ শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত হারে গরীব-দু:খীদের মধ্যে যে বিশেষ দান খয়রাত করেন, তাই "সাদাকাতুল ফিতর।"

কার ওপর সাদাকাতুল ফিতর ওয়াজিব

যাকাতের তুলনায় এটা ওয়াজিব হবার শর্ত অনেকটা সহজ ও শিথিল। ঈদের দিন নিছাব পরিমাণ সম্পদের অধিকারী প্রত্যেক ধনী ব্যক্তিকে তার নিজ পক্ষ হতে এবং পরিবার বর্গের ও পোষ্যদের পক্ষ হতে ফিতরা আদায় করতে হয়। এটা ব্যক্তিগত দান হলেও ইসলামী অর্থনীতির দৃষ্টিতে রাষ্ট্রীয় আয় হিসেবে পরিগণিত। তা না হলে, এ অর্থ গরীবদের মধ্যে কেউ বেশি পাবে, কেউ কম পাবে, আবার কেউ বা নাও পেতে পারে। কারণ, অনেকে লজ্জাশীলতার দরুন কিংবা অক্ষমতা ও পঙ্গুত্বের জন্য বঞ্চিত থেকে যাবে। তাই সাদাকাতুল ফিতর রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে আদায় করে গরীবদের মধ্যে বণ্টন করাই যুক্তিসঙ্গত। খুলাফায়ে রাশেদার যুগে এ ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছিল।

৯.২ নফল সাদাকা

সাদাকা দ্বারা ইসলামী অর্থ ব্যবস্থাকে গতিশীল ও ব্যাপক করা হয়েছে। বাধ্যতামূলক দান যাকাত ও ফিতরা ইত্যাদি তো মানুষ আদায় করতে বাধ্য। কিন্তু নফল সাদাকা বা সাধারণ দান মানুষের ইচ্ছানুযায়ী মানব কল্যাণের প্রয়োজনে ব্যয় করে মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থাকে সুন্দর সমৃদ্ধ করে তোলা যায়। তাই ইসলাম নফল দানের প্রতি সবিশেষ উৎসাহ প্রদান করেছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৯.৯

ক. নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন : এক কথায় উত্তর দিন-

১. সাদকা মানে কী?
২. সাদকা কত প্রকার।
৩. নফল সাদকা কী?
৪. সাদকাতুল ফিতর কী?
৫. সাদকাতুল ফিতর কখন দিতে হয়?

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. সাদকা বলতে কী বোঝেন?
২. সাদকাতুল ফিতর কী? লিখুন।
৩. সাদকা বলতে কী বোঝেন।

পাঠ ১০ ইসলামী অর্থব্যবস্থায় ব্যবসায় হালাল ও সুদ হারাম কেন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- ব্যবসায় কী তা বলতে পারবেন।
- সুদের পরিচয় দিতে পারবেন।
- ব্যবসাকে কেন বৈধ করা হয়েছে তার তাৎপর্য উল্লেখ করতে পারবেন।
- সুদকে কেন হারাম করা হয়েছে তার কারণ বলতে পারবেন।

১০.১ সুদ কী?

পবিত্র কুরআনে সুদকে বলা হয়েছে 'রিবা'। এর অর্থ বেশি হওয়া, বৃদ্ধি, বিকাশ, মূল অপেক্ষা বাড়তি অংশ। ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় রিবা বা সুদ হচ্ছে– "প্রদত্ত ঋণের উপর পূর্ব নির্ধারিত হারে অতিরিক্ত আদায় করা।"

ইবনে হাজার আসকালানী বলেন– "কোন পণ্য বা অর্থের বিনিময়ে অতিরিক্ত পণ্য বা অর্থ আদায় করাকেই 'রিবা' বলা হয়।"

মূলত কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে পূর্ব নির্ধারিত হারে অধিক পরিমাণ অর্থ আদায় করলে এবং পণ্য-দ্রব্যের ক্ষেত্রে একই জাতীয় পণ্য দ্রব্য কম পরিমাণের বিনিময়ে বেশি পরিমাণ নেয়া হলে অর্থ বা পণ্যের অতিরিক্ত অংশকে বলা হয় রিবা বা সুদ।

১০.২ ব্যবসায়-এর অর্থ

পবিত্র কুরআনে ব্যবসায়কে 'বায়' ও 'তিজারত' হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এর অর্থ বেচা-কেনা করা, ক্রয়-বিক্রয় করা, ব্যবসায়-বাণিজ্য করা। আর পারিভাষিক অর্থে ব্যবসায় বলতে বোঝায়- সেখানে ক্রেতা ও বিক্রেতা দু'টি পক্ষ থাকবে। বিক্রেতা একটি বস্তু বিক্রয়ের জন্য প্রস্তাব করে। ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয় ঐ পণ্যের একটি মূল্য ঠিক করে। ঐ মূল্যের বিনিময়ে ক্রেতা পণ্যটি কিনে নেয়। এ প্রক্রিয়াকে ব্যবসায় বলা হয়।

এক্ষেত্রে বিক্রেতা নিজে পরিশ্রম করে ও মূলধন খাটিয়ে পণ্যটি তৈরি করেছে। অথবা সে কোথাও থেকে পরিশ্রম করে পণ্যটি কিনে এনেছে। এক্ষেত্রে সে যে মূলধন খাটিয়েছে, তার সাথে নিজের পরিশ্রমের পারিশ্রমিক যোগ করে সে যে অতিরিক্ত দামে বিক্রয় করছে সেটা তার মুনাফা হচ্ছে। এক্ষেত্রে কোন হার নির্ধারিত নেই বরং লাভ-লোকসানের সম্ভাবনা আছে। ইসলামী পরিভাষায় একে ব্যবসায় বা বায় বলে এবং এটাকে বৈধ করেছে।

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট ও কল্যাণময় নীতিমালা উপস্থাপন করেছে। ইসলাম মানুষের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও সুবিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ব্যবসায়কে হালাল এবং সুদকে হারাম ঘোষণা করেছে। কেননা, সুদ হচ্ছে অর্থনৈতিক যুলুম ও শোষণের হাতিয়ার। সুদের অনিষ্ট শুধু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই নয়, বরং নৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও এর প্রভাব সুদূর প্রসারী।

১০.৩ ব্যবসায়কে বৈধ এবং সুদকে অবৈধ করার কারণ

১. আল্লাহর নির্দেশ

ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায় সম্পদের মালিক আল্লাহ। তিনি ব্যবসায়কে হালাল এবং সুদকে হারাম ঘোষণা করেছেন।

ক. "আল্লাহ তা'আলা ব্যবসায়কে হালাল ও সুদকে হারাম করেছেন।" (সূরা বাকারা ২:২৭৮)

খ. হে বিশ্বাসীগণ! যদি তোমরা বিশ্বাসী হও, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর ও সুদের যা বকেয়া আছে তা ছেড়ে দাও। যদি না ছেড়ে দাও, তবে জেনে রাখবে এটা আল্লাহ ও তার রাসূলের সাথে যুদ্ধ।" (সূরা বাকারা ২ : ২৭৮)

গ. হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা দ্বিগুণ-বহুগণ (চক্রবৃদ্ধি হারে) সুদ খেয়ো না। (সূরা আলে-ইমরান : ১৩০)

ঘ. যারা সুদ খায় তারা সেই লোকের মতো দাঁড়িয়ে থাকবে যাকে শয়তান স্পর্শ করে পাগল করে দিয়েছে।" (সূরা বাকারা : ২ : ২৭৫)

সুতরাং উক্ত নির্দেশসমূহের ভিত্তিতে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, যেহেতু সুদ সম্পর্কে আল্লাহর তা'আলার সরাসরি নিষেধ বাণী রয়েছে; তাই সুদ ও সুদি কারবার হারাম বা অবৈধ। অপর দিকে ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে আল্লাহর কোন নিষেধাজ্ঞা নেই বরং ব্যবসাকে হালাল ঘোষণা করা হয়েছে। তাই ব্যবসা বৈধ।

২. মহানবীর (স) বাণী

সুদকে হারাম এবং ব্যবসায়কে হালাল ঘোষণা করে মহানবী (স)-এর বহু বাণী রয়েছে যেমন–

ক. "সুদদাতা গ্রহীতা, সুদের সাক্ষ্যদাতা ও লেখক সকলের ওপর আল্লাহ অভিসম্পাত।"

খ. "সৎ ব্যবসায়ী পরকালে নবী-রাসূল, সিদ্দীকিন ও শহীদদের সঙ্গী হবেন।"

গ. সুদের গুনাহ ৭০টি। এর মধ্যে সবচেয়ে ছোট গুনাহ হচ্ছে আপন মায়ের সাথে যিনা করার চেয়েও বেশি গুনাহ।"
অতএব বলা যায় যে, মহানবী (স)-এর এসব বাণীর কারণে ইসলামী অর্থনীতিতে ব্যবসায়কে বৈধ এবং সুদকে অবৈধ করা হয়েছে।

৩. নীতিগত পার্থক্যের কারণে

ক. ব্যবসায়ে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে মুনাফার বিনিময় হয় সমান পর্যায়ে। কিন্তু সুদী কারবারের লেনদেনে সমান পর্যায়ে মুনাফা অর্জিত হয় না। সুদী কারবারে একপক্ষ লাভবান হয়, অপরপক্ষ ক্ষতির সম্মুখীন হয়।

খ. ব্যবসায়ে ক্রেতার কাছে বিক্রেতা একবারই লাভ করে থাকে। কিন্তু সুদী কারবারে সম্পূর্ণ মূলধন ফেরৎ না পাওয়া পর্যন্ত ঋণদাতা ঋণ গ্রহীতার নিকট থেকে সুদ আদায় করতে থাকে।

গ. ব্যবসায় অংশীদার ভিত্তিতে হয়ে থাকে। লাভ-লোকসান উভয় ক্ষেত্রেই সমান অংশীদার হতে হয়। অপরদিকে সুদী কারবারে সুদ গ্রহীতা এমন একজন অংশীদার যে লাভ-লোকসানের কথা চিন্তা করেনা। বরং নিজের নির্ধারিত মুনাফার দাবীদার হয়।

ঘ. ব্যবসায়ে ঝুঁকি আছে এবং এজন্য তা বৈধ; আর সুদে ঝুঁকি নেই এবং তা মুনাফার মত পরিবর্তনশীল নয়; তাই সুদ অবৈধ।

ঙ. ব্যবসায়ে মূলধন বিনিয়োগ করলে যে মুনাফা হয়, তা উদ্যোগ, যোগ্যতা, শ্রম ও দক্ষতার প্রতিফল। সুদের ক্ষেত্রে তা হয় না। কারণ ঋণদাতা কোন উদ্যোগ, শ্রম, যোগ্যতা ছাড়াই নির্দিষ্ট হারে সুদ আদায় করে।

৪. সুদের আর্থ-সামাজিক কুফলের কারণে

সুদের রয়েছে আর্থ-সামাজিক দিকের নানা কুফল। যার কারণে ইসলাম সুদকে হারাম ও ব্যবসায়কে হালাল করেছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৯.১০

ক. নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন : সঠিক উত্তরটি বেছে নিন-

১. সুদ হচ্ছে "প্রদত্ত ঋণের ওপর পূর্ব নির্ধারিত/অনির্ধারিত হারে অতিরিক্ত আদায় করা।
২. একই জাতীয় পণ্য-দ্রব্য কম পরিমাণের বিনিময়ে বেশি পরিমাণ/সম পরিমাণ নেয়া হলে ঐ অর্থ বা পণ্যের অতিরিক্ত অংশকে / কম অংশকে বলা হয় সুদ।
৩. ইসলাম মানুষের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও সুবিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ব্যবসায়কে নিষিদ্ধ এবং সুদকে বৈধ ঘোষণা করেছে।
৪. 'সুদ-দাতা গ্রহীতা, সুদের সাক্ষ্যদাতা ও লেখক সকলের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত/রহমত।
৫. সুদে রয়েছে আর্থ-সামাজিক দিকের নানা সুফল/কুফল।

খ. সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. সুদের সংজ্ঞা লিখুন।
২. ব্যবসায় কাকে বলে?
৩. ব্যবসায়কে বৈধ এবং সুদকে অবৈধ করার কারণ লিখুন।
৪. সুদ-নিষিদ্ধ করার বিষয়ে আল্লাহর ঘোষণা কী?
৫. সুদ অবৈধ-এ ব্যাপারে মহানবীর (স) তিনটি বাণী উল্লেখ করুন।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন : ৯

১. ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার পরিচয় দিন। এর বিষয়বস্তু লিখুন।
২. ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করুন।
৩. ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার বিবরণ দিন।
৪. ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার সম্পদ উৎপাদন, ভোগ ও বিনিময় নীতি উল্লেখ করুন।
৫. ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় আয়ের উৎসসমূহ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করুন।
৬. যাকাত কী? ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায় যাকাতের ভূমিকা আলোচনা করুন।
৭. যাকাতের নিসাব বলতে কী বুঝায়? সোনা-রূপার যাকাতের নিসাব বর্ণনা করুন।
৮. যাকাত ব্যয়ের খাতসমূহ উল্লেখ করুন।
৯. উশর, খারাজ ও জিযিয়া কাকে বলে? বিস্তারিত লিখুন।
১০. যাকাদ বলতে কী বুঝায়? ইসলামী অর্থব্যবস্থায় যাকাতের ভূমিকা নিরূপণ করুন।
১১. ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা একে হালাল এবং সুদকে কেন হারাম ঘোষণা করা হয়েছে? বিশদভাবে লিখুন।